সোজাসুজি সন্তোষকুমার ঘোষ

সোজাসুজি

সন্তোষকুমার ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬২

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশু দে
৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : চার টাকা

সোজাসুজি ? কিছু লেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত কেমন বেঁকে যায়। তার প্রমাণ সংকলিত টুকরোগুলো।

সমসময়ের ছাপ এই লেখাগুলোর সর্বাঙ্গে, যেহেতু বের হত দৈনিক পত্রাদিতে। দিন আনা দিন খাওয়ার ব্যাপার আর কী; কিন্তু তাকে বইয়ের শক্ত মলাটের মধ্যে জমিয়ে রাখার কি মানে হল ? জানি না।

দু'পাতা যিনি ওলটাবেন তিনিই বুঝবেন, লেখাগুলো বিদ্যা বা জ্ঞান দিয়ে নয়, সামান্য এক ব্যক্তির যৎসামান্য বুদ্ধি আর সহজ বোধ দিয়ে লেখা। সেই হিসাবে, কথাগুলো তার একার না-ও হতে পারে। হয়তো তার মতো সামান্য আর সকলের।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
স্নেহাস্পদেষু।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

কিনু গোয়ালার গলি, নানা রঙের দিন,
মুখের রেখা, জল দাও, ত্রিনয়ন,
স্বয়ং নায়ক, বহে নদী,
বাইরে দূরে, অজাতক
প্রভৃতি।

"ওরা"—আমরা ওদের "ভাষা বুঝিনে"

১.

সোজাসুজি কিছু লেখার বিপদ ঢের। তার মধ্যে একটা লেখকের নিজের বয়স। বর্শা-বল্লম ছুঁড়তে গিয়ে দেখি, সব জং-ধরা, তূণের তীর কবে ভোঁতা হয়ে গেছে।

এই সর্বনাশ করে সময়। ঘাট ছেড়ে মাঝদরিয়ায় সরে এসে পাড়ের চেহারা, তার ভাঙাচোরা স্পষ্ট আর দেখতে পাইনে, অনেকগুলো বছরের বাতাবরণে সবুজ দৃশ্যপট অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। আসল কথা, এই বয়সে আমরা এখনও যে বসবাস করছি, সেটা রিটায়ার করার পর এক্‌সটেনশনের কারুণ্যে। সম-সময়ের মধ্যে আছি, অথচ যেন ঠিক-ঠিক নেই। ইংরাজীতে যাকে বলে "সেন্‌স অব বিলংগিং"। বাংলায় তার হুবহু কোনও প্রতিরূপ এই ক্ষণে মনে পড়ছে না, তবে সন্ধান করে নির্ঘাত বুঝেছি, ওই "সেনস্"-টার অনেকটাই আমাদের খোয়া গেছে। পাকা-চুল পোলিটিশানেরা কী ঠাউরে শেষের সে দিন ভয়ংকর পর্যন্ত লড়ে যান জানি না, তাঁদের দেহ-মনের তাকৎ নমস্য। আমরা সাধারণ লোক ত্রাহি-স্বরে "ক্ষ্যামা দাও" বলতে পারলে বাঁচি। 'গাঁও বুড়া'দের কাল বহাল থাকলে তবু হয়ত সাবেকী সিক্কা টাকা-ঠাকা চলত, একালের খরিদ্দারেরা "অচল" বলে পত্রপাঠ সব ফেরত দেবে। সেকালেও দেখুন, বয়সের পাকামি সর্বদা মান্য হতে বলে মনে করিনে, হলে আর "বাণপ্রস্থের" বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল কেন!

যৌবনকে জয়টীকা দিয়েছে সব কালেই। "রাবি বেন এজরা" যতই না গলা ফাটিয়ে ডাকুন "গ্রো ওল্‌ড অ্যালং উইথ মি" ওরে

আমার কচি আর ওরে আমার কাঁচা-রা ফিরেও চাইবে না, মুখ টিপে হাসবে। তবে আর গায়ে পড়ে খয়রাতী বয়ান ঝাড়তে যাই কেন, বরং ওই "রাবি বেন"-এর কবিরই আর একটি লাইন "ফগ ইন মাই থ্রোট, দি মিস্ট ইন মাই ফেস" দিনের বাণীটি জপ করি।

২.

আজ বুদ্ধি দিয়ে যা ধরি, বোধে তার সাড়া পাইনে। না-পেতে পেতে খনির নগ্নগাত্র শ্রমিকের মত নেমে গেছি গভীর খাতে, সততার টর্চ জ্বেলে জ্বেলে স্মৃতি আর হৃদয় খুঁড়ছি। যে মিছিলকে আজ মনে করি উৎপাত, আমারই লেখা অনেক কাল আগেকার এক গল্পে সেই মিছিলেরই জয়ধ্বনি উচ্চারিত দেখে সেদিন চমকে গেছি। বছর কুড়ি বয়সের লেখা, প্রকাশিত এই আনন্দবাজারেরই একটা দোল সংখ্যায়, সব অর্থেই কাঁচা। তার সব কটা অক্ষর অবুঝ-সবুজে টসটস করছে।

এইভাবেই, পছন্দ করি বা না করি, একালের ছেলেদের হৈ-হাঙ্গামারও একটা মানে পেয়ে গেছি। পেয়েছি আমারই ছেলে-বেলাকে অতীতের খনির তলা থেকে কুড়িয়ে।

মনে পড়ছে, গোপালের মত অতি সুবোধ একটি বালকও একদিন পরীক্ষা দেয়নি, ইস্কুলে করেছে পিকেটিং, এক হাতে নিশান, অন্য হাতে লবণ নিয়ে আইন-অমান্য শোভাযাত্রার সঙ্গী হয়েছে। কেন ? যেহেতু অনেকের মত তাকেও শেখানো হয়েছিল—সে বিশ্বাসও করেছিল—ব্রিটিশ-শাসনের মত লজ্জা আর নেই, যেন-তেন-প্রকারেণ এই লজ্জাটা ঘোচানো চাই।

সেই বিশ্বাসটা নিশ্চয়ই সত্য ছিল ? মর্মান্তিক ছিল সেদিনের রাজনৈতিক-স্বাধীনতার অভাবের জ্বালা ? তেমনই এ-কালের ছাত্ররা যদি জেনে থাকেন, যদি মেনে থাকেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার বেলুনটা ফাঁপা, তাতে আর্থনীতিক স্বাধীনতার বাতাস ভরপুর নেই,

নেই শোভন-মসৃণ বৈষয়িক বিন্যাস—তবে সেই অনমৃত স্বরাজ্য দিয়ে তাঁরা করবেন কী ? রুখেও দাঁড়াবেন বৈকি !

যদি বলেন, এই অবিশ্বাস ওদের নিজেদের ভিতর থেকে আসেনি, শেখানো হয়েছে, একালের শিক্ষকেরাই দীক্ষাগুরু, তবু বলব, এই ধারাই তো বরাবর চলছে। আমাদের কালেও শিক্ষকেরা "ম্যাটসিনি গ্যারিবলডি" প্রভৃতির জীবনী থেকে করতেন পাঠ, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" পদ্যটি পড়তেন সুর করে, রাষ্ট্রিক মুক্তির অনুপ্রাণনা সঞ্চারিত করে দিতেন প্রাণে প্রাণে। রাষ্ট্রিক সাধনায় যা সুধা, বৈষয়িক রূপান্তরের প্রয়োজনের বেলাতেই কি তা বিষ ? এ-কথা বলা "ডবল-স্ট্যানডারড" প্রয়োগ করা। এ হয় না।

সেদিন যে-আগ্রহে সত্যাগ্রহ করেছি, বর্জন করেছি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, আজও সেই আগ্রহই মূর্ত দেখি। হয়ত আগ্রহের আকার আরও উগ্র, উপায় আরও সবল, কিন্তু মনে রাখতে হবে, একালের হতাশাও তো আরও ব্যাপক, তরুণ জনসমষ্টি সংখ্যাতেও তো বেশি !

তাছাড়া তলিয়ে দেখুন, ওই উগ্রতা বা মিলিট্যানসি তারুণ্যের ধর্মেও। উত্তেজনায় তাদের রক্ত নাচে। অস্থিরতায় তারা প্রচলিত নিশ্চিন্ত সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে—এসটাব্‌লিশমেনটের বিগ্রহের বেদী ধরে নাড়া দেয়, সর্ব দেশে, সর্ব কালে। নতুবা যেখানে আপাত-দৃশ্য কোনও হেতু নেই, যথা ফ্রান্সে, যথা জার্মানিতে, সেখানেও সুস্থ-পুষ্ট-সচ্ছল ছাত্রসমাজ—অশান্ত গরুড়সম অসুখী নখে দেয়াল আঁচড়াত না।

দেখুন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই উদাত্ত বাণী আমাদের ছাত্রদের আমরাই পাখি-পড়া করে পড়িয়েছি। নবীন মল্লিনাথেরা নিজেদের মত করে ওই মন্ত্রের অন্য একটা অর্থ বের করে প্রাপ্য-বর বুঝে পড়ে নেবে বলে নেমেছে। এ-আহ্বান "ওয়ারকারস অব দ্য ওয়ারলড ইউনাইট্"-এর সগোত্র।

৩.

কথা উঠতে পারে, এই অস্থিরতা, বিক্ষোভ, অবিশ্বাস বা বিশ্বাস খাঁটি কিনা। এর কতটা ধমনীতে বয়, কতটা শুধু চোখের পাতায় নাচে। এর মধ্যে সততা সর্বাংশে আছে কিনা ; একে খাড়া রাখতে সাহসের শিরদাঁড়াই বা কোথায়।

সেখানে যদি ঘাটতি দেখি, একটু পীড়া বোধ করি বৈকি। শুধু পটকা আর পাটকেলে কি বিপ্লব হয়? রাত্রির আড়ালে দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার ল্যাপটালেও না। আর, মনের কথাটা সাফ-সাফ মুখেও আনতে হয়। এই ঋজুতা সর্বত্র দেখি না।

দোষটা যাঁরা শেখান তাঁদেরও হতে পারে। নইলে শেখানোতে দোষ নেই, আগেই বলেছি, ওই রীতি আবহমান।

এমন-কী তাদের জন্য তারা সর্বদা নিজে থেকে সোচ্চার হয়েছে, সামাজিক ইতিহাসের কোনও পাতায় এর সায় নেই। ইন্ধন থাকে, একদিন একজন দেশলাইয়েব কাঠি ছোয়ায়। কিংবা মিষ্টি করে বলতে গেলে, ঘুমন্তর গায়ে সোনার কাঠি। ঘুমন্ত অর্থাৎ যারা "নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে" ইত্যাদি। এইভাবে পরিশ্রমী, জার্মান পণ্ডিতের মুখেই শতাধিক বর্ষ আগে উদ্‌গীত হয়েছে এ-কালের সবচেয়ে আকর্ষক অর্থশাস্ত্র। অনেক পরে তা দেশে দেশে জনে-জনে ছড়িয়ে পড়েছে। তার শোধিত বা নৈকষ্য রূপ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, হীনযান-মহাযানে সেই আদি তত্ত্ব ভাগ হয়ে যাক না, এদিকে বা ওদিকে বিশ্বের জনমত আজ কিন্তু বিভক্ত। তত্ত্বটা তত্ত্ব হিসেবে যাঁদের দ্বারা ত্যক্ত, তাঁদের কাছেও ওই তত্ত্বের যে-নির্যাস সামাজিক ও আর্থনীতিক সুবিচার, তা স্বীকৃত। কোনও কোনও রাষ্ট্রে কপিরাইট না মেনেও অনুকৃত।

অতদূরে নাই বা গেলাম, প্রসঙ্গটা ছিল, যাঁদের কথা তাঁদের হয়ে আর কেউ বলে দেবে কিনা। দেয়, দিয়েছে, দিচ্ছে। বিবেচনা

করুন, এদেশেও একদা "বিলেত ফেরতা ক' ভাই" মিলেই কংগ্রেস-আদি রটিয়েছিলেন। যাঁরা রটান, ইংরাজ-রাজে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনেকেরই লাভ বই লোকসান ছিল না। মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে প্রবল আন্দোলনের সহায় হয়েছিলেন প্রধানত তাঁরা, যাঁরা আলিগড়ে আলোকপ্রাপ্ত! অস্পৃশ্যতার পাপ দূর করতে যিনি পণ করেন তাঁর জীবন, সেই গান্ধীজী নিজে কি ছিলেন অচ্ছুৎ?

ইনস্টিংট-এর বশে চলে কেবল অবোধ মানবেতর প্রাণী। তাকে বলে দিতে হয় না। মানুষকে তার খাদ্য-পথ্য অন্যে চিনিয়ে দেয়। ঘুমের ঘোরে শিশু তো কেবলই তার গা থেকে লেপ সরিয়ে দেবে; মা আবার লেপ টেনে তাকে দেন ঢেকে—এ-ও সেইরকম।

সেই নিয়মেই আজ সমাজতান্ত্রিক, সাম্যতান্ত্রিক আলোড়নের পুরোভাগে তাঁদেরও দেখি, যাঁরা কুল-লক্ষণে হয়ত সামাজিক কুলীন, "প্রিভিলেজড"-শ্রেণী-সম্ভূত। আসল কথা উপলব্ধি, আসল কথা জ্ঞান, মর্মে-মর্মে বোধ এবং সহানুভূতি। ওগুলো আছে কিনা, পরখ করে দেখলেই হল।

যাঁরা ঋত্বিক, তাঁরা সর্বকালেই সংখ্যায় অল্প; আলো জ্বালেন, দিগ্বিদিক দীপ্যমান হয়। "মাইনরিটির" ধুয়ো তুলে দুয়ো দেবার প্রয়াস বৃথা। পথিকৃৎবৃন্দ সর্বত্রই সংখ্যালঘু। যদি মুষ্টিমেয়ও হন, তবু সংখ্যার ঘাটতির পূরণ হয় প্রতিজ্ঞায়। বিশ্বাসী, দুঃসাহসী, সংকল্পগ্রথিত একটি দল অঘটন ঘটাতে পারেন, তার প্রমাণ আমাদেরই অগ্নিযুগ। সকলের মাড়ানো রাস্তায় তাঁদের আস্থা ছিল না, তাই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন দুর্গমকে আর দুঃসাধ্যকে। সেই কাহিনী বিধৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, অসংখ্যের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে। না থাকলে, এতদিন পরে লালদীঘির নাম দীনেশ-বাদল-বিনয়ের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে তো আমরা ধন্য হতে চাইতাম না।

"বিদেশী ভাবধারার" দোহাই-ও আমি একই কারণে খারিজ করেছি। একদা আমিও ওই যুক্তি তুলে ইদানীংকার অনেক কিছুকে

নস্যসম উড়িয়ে দিতুম। তারপর একদিন হঠাৎ টের পেলুম, যুক্তিটা মেকী। উৎস বিদেশী হলেই যদি "গেল গেল" রব ওঠে, তবে পশ্চিম এশিয়ার খৃষ্ট কি অধিকার করতে পারতেন ইউরোপীয় ভূখণ্ড, গৌতম বুদ্ধ বিস্তারিত হতে পারতেন সারা প্রাচ্যে? সেকালের ধর্মমত যদি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ব্যাপ্ত হতে বাধা না পেয়ে থাকে (মনের গ্রহণের কথা বলছি, বিশেষ সময়ের শাসককুলের প্রতিবন্ধ নয়), তবে একালের সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ধর্মমতের বেলাতেই বা দেয়াল তুলব কেন? আজকের গান্ধী নানা দেশের অসহায় মানুষদের আন্দোলনে প্রেরণার দীপ, এ-কথা যখন শুনি (মার্টিন লুথার কিং প্রভৃতি ভাবশিষ্য একলব্যের মুখে দ্রোণাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত), তখন যদি পুলকিত হতে পারি, তবে মাও বা গীভেরার মুখের উপর কোন মুখে দরজা বন্ধ করব? শুধু বিদেশী বলে?

"বিদেশী", নিছক এই ছুতোয় অতএব কাজ হবে না। মাও-য়ের মহড়া যদি নিতে হয়, তবে নিতে হবে অন্য যুক্তির কাঠখড় পুড়িয়ে, ফলশ্রুতি প্রভৃতি বিচার করে।

অপিচ, বিবেচনা করুন, "ব্যক্তি-স্বাধীনতা", "সংসদীয় গণতন্ত্র" ইত্যাদি যতেক কুসুমে ইদানীং আমাদের সাজি সাজিয়েছি তার কোনোটাই ভারতীয় তপোবনে সঞ্জাত নয়। গোলাপের মতই আমদানি এবং কেয়ারি-করা বাগানে ফোটানো।

৪.

কথায় কথায় সরে এসেছি। গোড়ার কথাটা ছিল এই—নিজের অতীত আর নিজের নিরাবরণ সততার সঙ্গে মুখোমুখি হতে চাইনে বলেই আমরা পরম-পাকারা "চণ্ডালিকার" মার মত মাথা নেড়ে নেড়ে বলি, "আমি যে তোর ভাষা বুঝিনে।"

বুঝিনে অনেক কিছুই। আজকের অনেক ঘটনা, অনেক সমাবেশ, নির্বাচনী ফল, এইরকম আরও কত। অথচ আমাদের রুচি-মরজিকে

তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে সবই ফটাফট ঘটতে থাকে। মরমী মন নিয়ে বুঝতে চাওয়া চাই, এ-বয়সে নতুন করে পাঠাভ্যাসের মত। কান নড়িয়ে নড়িয়ে এ-কথা বলা বৃথা, "কোরো না, কোরো না, এসব করতে নেই।" ওরা শুনবে না, করবেই। আর অট্ট হেসে বলবে, "আপনারাও একদিন করেছেন, এবার আমাদের করতে দিন! দেখুন, তখন যা করতেন, এখন তো তার অনেক কিছুই করেন না। দৌড়ঝাঁপ, হা-ডু-ডু, ফুটবল সব বন্ধ। এখন গ্যালারিতে বসে দেখুন। মচমচ করে পাঁঠার হাড় আর চিবোন না, এখন চোষেন শুধু। মেয়ে দেখলে কেউ শিস দিলে, হা-হা-হা-হা করেন, অথচ আপনারাও কি দেন নি? এখনও দেন—মনে মনে। যে-বয়সের যে-কাজ। এক-এক বয়সের এক-এক কাজ। আপনারা যা করার তা করেছেন, এখন আমাদের সময়, আমাদের করতে দিন। আপনার বয়স পেলে, কে জানে, আমরাও হয়ত করব না।"

ওদের জবানে এই সংলাপ নিজেই রচনা করে, নিজেই শুনি। থতমত খাই। রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্পের মোহিতমোহনের মত "পূর্ব ইতিহাসে" অবগাহন করি আর ক'জন। অতীতের জলরাশি দেখলে বয়সের এই শীতে শরীর শিরশির করে।

তা-ছাড়া, ওদের কথা আমরা বানাতেই বা যাব কেন? বানালে তার মূল্য বড়জোর হবে ডকুমেনটারি—তথ্যচিত্রের মতন। হয়ত-বা বর্ণনাতেও নিপুণ হবে। কিন্তু তা প্রাণের তাড়নায় ঝলসে উঠবে না। সাম্প্রতিক সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত দেখেছি—"প্রজাপতি", "যদুবংশ", "বাঘবন্দী"। চলচ্চিত্রে "আপনজন"! উত্তম, কিন্তু সেখানেও তো পরের নয়ন? ওদের কথা আমরা তো কতই বলেছি, এবার ওরা বলুক।

অবিশ্বাস পার হয়ে—

আজ এই সকাল বেলাতে লঘুগুরু নানা ভাবনার টুকরো মনে মনে সাজাচ্ছি আর টিটকারি দিচ্ছি নিজেকে : সারা জীবন ধরে শুধু সংশয় সংগ্রহ করে গেলে, ছিঃ! শুধু তর্ক আর প্রশ্ন দিয়ে খুঁচিয়ে মারলে নিজেকে।—"তাই জনম গেল শান্তি পেলি না", আরও একজন একবার এই বলে আত্মবিলাপ করেছিলেন না? তিনি ফেলে এসেছিলেন কাকে? তাঁর বিশ্বাসকে? মনে হয় না। তাঁরই যদি ওই আক্ষেপ, তবে যারা অবিশ্বাসের পাথর বুকে চেপে আছে বলে ভালো করে নিঃশ্বাসও নিতে পারে না এই কালে, তাদের উপায়, তাদের গতি? ভাবতেও পারছি না।

অবিশ্বাস—ছোট এবং বড়। চাটনি দিয়ে শুরু করে ব্যথাটাকে হালকা করা যাক। যেমন, পাবলিক সেকটরে অবিশ্বাস! সেটা এই লেখকের পক্ষে শাপে বর! যেহেতু হরিনঘাটার দুধের সে গ্রাহক হয়নি, তাই—পশ্চিমা গোয়ালার কৃপায় তার বাড়িতে যোগান বিশ্বস্ত এবং অব্যাহতই থাকে। ঈষৎ জলমিশ্রিত? হলই বা। নেই-দুধের চেয়ে জোলো দুধ, ইত্যাদি।

এই লেখক বিশ্বাস করে না পাতাল রেলেও। ও-বস্তু দুনিয়ার যথা-তথা যতই থাক, এখানে হবে না। কলকাতায় পাতাল-রেলের কথা উঠলেই তার সেই মজার গল্পটা মনে পড়ে। কে যেন কিছুকাল বিলেতে ছিল, ফিরে এসে আর বাংলা বলে না। শুনে বিচক্ষণ এক ব্যক্তি বললেন, "তবে তো তোর ভারী মুশকিল হল রে? ইংরিজী শিখলি না, আবার বাংলাও ভুললি?" পাতাল রেল নিয়েও সেই ভয়। হবে না, হলেও কবে হবে, হলপ করে বলা যায় না, অথচ

বিস্তর টাকা মাটি এবং বিস্তর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি হবে। ভাঙাচোরা রাস্তায় দু'চারটে গাড়িঘোড়া সমেত গতায়াত তবু যা চলছে—কায়ক্লেশে, এবং রীতিমত ক্লেশে—তাও বন্ধ হবে। খোঁড়া রাস্তা-গুলোর দু' পাশে উঠবে পাণ্ডুরাজার ঢিবি। যশোর রোড, বি টি রোড আর হালের স্ট্র্যানড রোডের দশা স্মরণ করেই কথাটা লিখছি। পাইপ বসাতেই যেখানে এই ধুন্ধুমার কাণ্ড, সেখানে পাতাল রেল? বাস্ রে, কাজ নেই হয়ে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তবে আমার চেয়েও যাঁরা অবিশ্বাসী, তাঁরা বলতে পারেন, খামোখা ভাবছেন, কিশ্সু হবে না। ড্যালহৌসি পাড়ায় এই যে কত খোঁড়াখুঁড়ি চলেছিল ক'বছর আগে—সাব্ওয়ে হল? হয়নি। ক'জন ঠিকাদারের পকেট ভরল বটে।

* * *

বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না যে, নব কংগ্রেসের কাছে স্বতন্ত্র দল অচ্ছুৎ। তা-হলে গুজরাটে এ ওর হাতে হাতখানি রেখে এগোতেন কী করে? বিশ্বাস করি না যে, কেন্দ্রে আদি কংগ্রেস আর স্বতন্ত্র দলের মধ্যে বিবাহের কথা পাকা হয়ে আছে। হলে ওখানকার সখারা অন্যখানে ল্যাং মেরে কাত করার মজায় মেতে কেন উঠবেন!

বিশ্বাস করি না যে, বিচ্ছিন্নতা-কামনা কিংবা সংবিধান সম্পর্কে কেন্দ্রের কিছুমাত্র মাথাব্যথা আছে। থাকলে দাক্ষিণাত্যে বা উত্তর-পশ্চিমের দু'টি দলের সঙ্গে আঁতাত করতে তাঁদের অবশ্যই আটকাত। আটকায়নি বলেই এখানে অনুরূপ সমস্যার মোকাবিলা করতে আটকাচ্ছে। দক্ষিণাপথে যা শুদ্ধ পূর্বাঞ্চলে তাকে কি জোর গলায় অশুদ্ধ বলা চলে, শুধু বামপন্থী বলেই? নিজের আত্মখণ্ডনে দিল্লি নিজেই কয়েদী হয়ে আছে।

এই আত্মখণ্ডনের ছাপ দেখি সি-পি-এম এর বেলায় আদি কংগ্রেসের "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" গোছের হাবভাবে। আবার নব

কংগ্রেসী সরকারেরও সি-পি-এম এর প্রতি আচরণে। বিধিবদ্ধ দলের সুবিধাদি এই দল পাবে। অথচ ক্ষমতায় তাকে আসতে দেওয়া হবে না, কিংবা এলে দেওয়া হবে না থাকতে—এই দ্বিচারণার মধ্যে। দ্বিচারণার সঙ্গে মিশে আছে দ্বিধাও। এই দলকে কেন্দ্র চটাবে, তাই বলে খুব বেশি ঘাঁটাবে না। এই হেতু যে, এঁদের ভোটগুলি সরকারের কাছে মাঝে মাঝে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।

* * *

অবিশ্বাসী পরকলা পরে বামপন্থী মহলের নানা শিবিরেও কি ক্লিষ্ট চেহারা ফুটে উঠতে দেখছি না? ওই তো মুশকিল—যে কর্মপন্থা বৈপ্লবিক অথচ ভোটভিত্তিক, তার স্ববিরোধিতা ক্রমশ ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে, একই সঙ্গে আবেদন আর আস্ফালন উভয়কে মিলিয়ে এখন রঙ টেকানো দায়। টেকাতে হলে সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে। বরাবর বিপ্লব চাই-ই চাই বলে হঠাৎ তার অন্য মূর্তি দেখে "এ-বিপ্লব সে বিপ্লব নয়" (এ-জহর সে-জহর নয় ?) বলে আঁতকে উঠলে চলবে কেন ? নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের মোয়ায় তারুণ্যকে কি ভোলানো যায় ? একটা বয়স শক্ত একটা খোরাক চায়। হয় বলতে হবে বিপ্লব ভালো, নয় বলতে হবে ভালো নয়। এ-বিপ্লব ভালো, ও-বিপ্লব ভালো নয়, এ-সব যুক্তি নিষ্ফল, ছলনা।

আমাদের কথা বাদ দিন, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছি। সেকালের চরকাতে আমাদের মন উঠত না বটে, তবে বিপ্লব দেখিনি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়েও না, কারণ তখন খাবারের দোকানের বাইরে বহু নিরন্ন কঠিন শানে প্রাণ দিল, কিন্তু কোনও দোকানের একটা কাঁচও ভাঙেনি। পরে খাদ্য-আন্দোলনে পুড়েছে স্টেশন, ডাকঘর ইত্যাদি। অথচ একটা চালের গুদামও লুট হয়নি।

সে-আমল বদলে যাচ্ছে, টের পাচ্ছি, কিন্তু নতুন যুগের ভোরে জাগব যে, সেই জোরই বা পাচ্ছি কই। আবার এই ত্রিশঙ্কু বয়সের

কী যন্ত্রণা, পরমপাকাদের সঙ্গেই কি সুর মেলে? তা-ও মেলে না। যেমন, লেনিনের নামে একটি স্কোয়ারের নামকরণের প্রস্তাবে যাঁরা বিচলিত, তাঁদের বলছি, আপত্তিটা লেনিন বলেই কি? নতুবা শেক্সপীয়রের নামে এই শহরে যখন একটি সরণির নাম রাখা হল, তখন কেন গদ্‌গদ হয়ে গিয়েছিলাম সক্‌কলে? শেক্সপীয়র অবশ্যই স্মরণীয়, নমস্য এবং বরণীয়। কিন্তু কলকাতায় মহাকবি কালিদাসের নামে যে একটা রাস্তা নেই (অথচ জনক আছে পরাশর আছে), সেটা তো কারও মনে পড়ে না?

* * *

হায়, এই সব প্রশ্ন কত দূরে টেনে নিয়ে যায়। ন্যূনতম সততার আত্ম-জিজ্ঞাসার পৈঠাটি বড় সরু, সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই হয় না। তাই প্রগতিবাদী কোনও নেতা যখন বলেন হিন্দুদের পূজাপার্বণ, সর্বজনীন নিয়ে মাতামাতি প্রতিক্রিয়াশীল কাণ্ড, তখন তাঁর সাহসকে বলি সাবাশ্‌। পরক্ষণেই কিন্তু আক্রান্ত হয়ে পড়ি সংশয়ে: পূজা না হয় কমল, কিন্তু ব্যক্তিপূজা? সেটাও কমবে তো? হিন্দু সমাজ সংস্কারমুক্ত হোক, উত্তম। কিন্তু যে-অঞ্চলে অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্য? সেই এলাকায় সাম্যবাদী সমাজবাদী, কোনও দল ভরসা করে হিন্দু প্রার্থী দাঁড় করাবেন? প্রশ্নের এই অংশের উত্তর, জানি মিলবে না। ফলত এ-ও জানি, সংস্কার-প্রয়াস হবে একদেশ-দর্শী।

নিরালায় স্বগত-কথনই ভালো, যেহেতু এই লেখক হয় নগ্ন-নির্জন-ভাবে সমদর্শী, সোজা ভাষায় যার নাম অবিশ্বাসী। বিশ্বাস কোথাও কি কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই? ভিতরে বাইরে চাইছি আর খুঁজ্‌ছি—এই বৈশাখের আকাশের কোনও কোণে মেঘের লেশ। আশ্চর্য ঘটনা দেখুন, তখনই রাস্তার ধারে, অনেক ছাদ আর মাঠ পেরিয়ে অভ্রান্ত কৃষ্ণচূড়ার জ্বলজ্বলন্ত বিস্ফোরণ চোখে পড়ল। ফুল ফুটুক না ফুটুক নয়—ফুটেছে। বোম্‌ ফাটুক না ফাটুক, একটা দুটো পাখিও

গাইছে—রাতের আকাশ হঠাৎ, বরাবর যেমন, তেমনই, তারায় তারায় খই-ভাজার ওলটানো কড়াই হয়ে গেল। জাগতিক আর মহাজাগতিক নিয়ম চলেছে পাশাপাশি।

আর এই দগ্ধ ঋতুতে কৃষ্ণচূড়া, এ বড় বিস্ময়। সারা বছর এই গাছগুলো যে কোথায় থাকে, কেউ টের পায় না, যেন কোন গুপ্ত সংগঠনের মতো—অথচ সময় হলেই ফুলঝুরি হয়ে পড়ে। যাই ঘটুক না, প্রকৃতিও সমভাবে এবং সমান্তর পথে কর্মরত এ-কথা যেই অনুভব করি, অমনই আবিষ্কার করি কে বলে আমার বিশ্বাস নেই? এখনও আছে একটু একটু/কিছু কিছুতে। অন্তত ওই কৃষ্ণচূড়ায় বিশ্বাস করি।

কষ্ট বিশ্বাসীদেরও

[এই দৃশ্যটিতে একমাত্র লেখক ছাড়া আর সব চরিত্র অদৃশ্য থাকবে। তাদের প্রবেশ বা উপস্থিতি অনুভূত হবে শুধু কণ্ঠস্বরে।]

লেখক : সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখের পর মুখ—আপনারা কারা ? ব্যক্ত বা অব্যক্ত স্বরে সবাই কিছু বলছেন—কী ?

একটি কণ্ঠ : কেন, চিনতে পারছ না ?

লেখক : ঠিক চিনতে আজকাল আমি কাউকেই পারি না। সব ঝাপ্‌সা লাগে। চশমার কাঁচের পাওয়ার বদলাতে হবে। কানেও যা শুনি তার মানে বুঝতে পারি না। যেন মনে হয় কোনও নতুন দেশে এলাম। অথবা অনেক কাল ছিলাম না, ফিরে এলাম। ছাত্রপাঠ্য একটা ইংরেজী গল্পে আছে না ? কে যেন কুড়ি বছর ঘুমিয়ে কাটিয়ে হঠাৎ জেগে উঠল, তখন আর কিছুই তার ঠাহর হয় না। আমিও তেমনই বুঝতে পারছি না কিছু। জিজ্ঞাসা করছি নিজেকে, জিজ্ঞাসা করছি আপনাদের—এই বিশ-বছর আমরাও কি তবে ঘুমিয়ে কাটালাম ? সদ্য জেগে উঠে তাই কিছু বুঝছি না, মেলাতে পারছি না ?

অন্য কণ্ঠ : ঠিক তা-ও নয়। আমরা সবাই রূপোর টাকার সময়ে জন্মেছি যে, সেই সময়ে বড়ো-ও হয়েছি। সেই টাকা বাজত, তাকে বাজানো যেত। এখনকার নোট সব খসখসে, কাগজের। চারধারে যত কিছু দামের ধস্ দেখছ, সব সেই জন্যেই। ওই রূপোর টাকা ছিল অনেকগুলো মূল্যবোধ আর বিশ্বাসের প্রতীক।

লেখক : বিশ্বাস, বিশ্বাস। আমার নেই।

বহু কণ্ঠ, এক সঙ্গে : প্রতিবার সেই কথাই তো লিখে যাচ্ছ, তুমি। আমাদের কথা এক লাইনও নয়। মনে রেখো, বিশ্বাসীদের কষ্টও কম নয়।

লেখক : কষ্ট ? তবে যে বিশ্বাসে মিলায় মুক্তি শুনেছিলাম ?

কোনও কণ্ঠ : মেলে, কিন্তু কিসের মূল্যে ? যুক্তির। প্রথমে তো ছোলা-ছাতু খাইয়ে খাইয়ে বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখাই শক্ত। দ্বিতীয়ত, নিত্য জপালে আর পড়ালেই কি তোতা-পাখি পোষ মানে। সে-ও খালি খালি খাঁচাছাড়া হতে চায়।

লেখক : পাখি বলবেন না। বিশ্বাসকে বরং বলুন প্রতিমা।

সেই স্বর : বেশ তাই সই। অনেক কাঠ-খড় ঠুসে সেই প্রতিমাকেও খাড়া রাখতে হয়। তবু সে ধসে পড়ে। সেইদিন বিশ্বাসীর আত্মা আর্ত চিৎকার করে। বলে, দেবী নাই।...উর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।... এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী, তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু সহ্য কি করিত দেবী ? মহত্ত্ব কি তবে ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি মূঢ় পাষাণের স্তূপে ? রঘুপতির হাহাকার-মনে পড়ছে ? হয়ত রঘুপতির নয়, এ-কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই। ঈশ্বরের সর্বমঙ্গলামঙ্গল্য স্বরূপে মাঝে মাঝে তাঁরও আস্থা নড়ে যেত, কিংবা গিয়েছিল।

লেখক : কিন্তু শ্রেয়ো-বোধ ছিল—তাঁর কবিতার বিষয়ে একটি অসাধারণ গ্রন্থে পড়েছি।

সেই কণ্ঠ : ছিল, এক ধরনের অভ্যস্ত পোশাক, সংস্কার একটা বয়সের পরে আর ছাড়া যায় না বলে।

ওই স্বরকে চাপা দিয়ে তখন আর একটি স্বর স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নতুন স্বর, মার্জিত, পরিশীলিত, বলবে—"এ-কথা ঠিক নয়"।

লেখক : আপনি কে ?

নতুন স্বর : ওই বইটি আমিই লিখেছি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নই, কিন্তু মানবতায় বিশ্বাসী। মনুষ্যজাতি ধীরে ধীরে মনুষ্যতরতায় উত্তীর্ণ হচ্ছে—আদিম যুগ থেকে, বর্তমান-তমসা থেকে জ্যোতিতে

ক্রম-গমনের ইতিহাস। নতুবা গৌতম বুদ্ধ, যীশু, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী সম্ভব হতেন না।

লেখক (তিক্ত, হতাশ): ওঁরা ব্যতিক্রম, অন্ধকার আকাশে আকস্মিক এক-একটা উল্‌কার মতো, এক-একটি কোকিল দেখে এক-একটা বসন্ত ঋতুর কল্পনা করবেন না। কী হত সেই তথাকথিত আদিম যুগে? যূথবদ্ধভাবে এক দল হয়ত অন্য দলের উৎসাদনে মেতে উঠত, অথবা ব্যক্তিগত হঠাৎ-হিংসায় অন্ধ কেউ হয়ত লোষ্ট্রাঘাতে নিহত করত কাউকে। সে-আচরণও গর্হিত, তবু তার অর্থ বুঝি। কিন্তু কাউকে মারলাম, তারপর তার রক্ত ছিটিয়ে দিলাম তার আপন জনের মুখে; কারও পেটে ছুরি বসালাম, সে যখন কাতরাচ্ছে তখন সেই ক্ষত স্থানে দিলাম নুন ছড়িয়ে, এই নিষ্ঠুরতাকে পাশবিক বলতেও প্রবৃত্তি হয় না। আমি তো একে বুঝি না। বুঝতে পারি না অহরহ সংঘটিত এইসব ঘটনে-অঘটনে নিজের বিকারহীনতাকেও।

অন্য কণ্ঠ: তার মানে সয়ে যাচ্ছে। যেমন ক্রমশ আমাদের সয়ে যায় নগর-জীবনের ভীষণ ঘর্ঘর, খোলা নরদমার পচা গন্ধ, এইসব। যেমন দুর্ভিক্ষে মৃত নিরন্নের শব দেখে শিউরে উঠতেও এক-দিন ভুলে গেলে, দাঙ্গার বীভৎসতাকেও পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে গ্রহণ করলে, এ এক ধরনের বীজাণু থেকে ইমিউনিটি অর্জন। নিজের সংবেদনা আর বিবেকের সংক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে যাওয়া, নয় কি?

লেখক: আগে পারতাম, কেননা তখন বয়স ছিল। এই বয়সে মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়া কঠিন।

সেই কণ্ঠ: এই বয়সে প্রতিবাদ তো কঠিন আরও। বরং মেনে নেওয়াই ভালো। ভুলো না, এটা পারমিসিভ্ সোসাইটি, এখানে মিনিম্যাল প্রশাসন। এখন এই নিয়ম।

লেখক (ভগ্নকণ্ঠে): তবু বলবেন মানুষ মনুষ্যতরতায় উঠে যাচ্ছে? একে বেঁচে থাকা বলবেন? বলুন, কিন্তু আজ 'বাঙালী' এই পরিচয় নিয়ে সুদ্ধ এই টিঁকে থাকাকে বেঁচে-থাকা বলে বড়াই যেন না করি,

আমার মতো কেউ যেন না করে। আপনাদের মতো বিশ্বাসে বুঁদ হয়ে থাকলে তবু সম্মান না-হোক, শান্তি পেতাম।

[মঞ্চে কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর—]

একটি কণ্ঠ (জর্জর): আমাদেরও অনেক কষ্ট। আগে একটা বিশ্বাসের বশে অন্য সব কিছুকে প্রকাশ্যেই ধিক্কার দিতাম। কোনও অন্যায়, অনিয়মকে রেয়াত করিনি। বলতাম, 'নাথিং কুড্ বি ওয়ার্স।' এখন? এখনও তাই বলি। তবে মনে মনে। মুখ খোলা যায় না, তাই বুঁজে থাকি—ওই রীতিতে এক ধরনের একটা পারসোনাল সেভিং বন্‌ড্ ক্রয় করি, বড় জোর কখনও-কখনও বিশ্রী ঘটনার প্রতিবাদে সর্বশ্রীমণ্ডিত বিবৃতিতে সই-টই দিয়ে রাখি।

কণ্ঠ ২: আমি প্রখ্যাত লেখক। আকৈশোর রবীন্দ্রনাথ আর অন্য এক রাষ্ট্রের মহান নায়কের যুগলমূর্তি পাশাপাশি রেখেছি। আজ ভয় হচ্ছে, বুঝি আর পারব না। কে যেন ফিস-ফিস করে বলে দিচ্ছে, প্রথম জনকে বিসর্জন দিতে হবে।

কণ্ঠ ৩: আমার কষ্ট আরও। একটি ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডে বিহ্বল হয়ে একদিন লিখেছিলাম "তিনটি গুলি।" তিনটিই, এতদিন পরে দেখছি, লক্ষ্যভ্রষ্ট। সমকালের সঙ্গে সমঝোতার তাগিদ অন্য বিগ্রহকে পূজার মন্ত্র পড়িয়ে নিচ্ছে।

কণ্ঠ ৪: আমি প্রগতিপন্থী সুকণ্ঠ গায়ক, আমাকে চিনছেন না? জনপ্রিয়তার ঢেউয়ের চূড়ায় চড়ে যতদূর এগোনো যায়, এগোচ্ছিলাম —ওই আমার প্রগতি। রবীন্দ্রসঙ্গীতকেও সঙ্গী করেছিলাম। আর বোধহয় পারব না। "মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে। একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে" কিংবা "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" এইসব গানের ভাব আমার শৌখিনমৌখিক বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিসংবাদী। বলছেন ওই গান ছেড়ে দেব? ছাড়তে কলজে ছিঁড়ে যাবে! রবীন্দ্রনাথকেও ভালবাসতাম যে। আমার কষ্ট ওইখানে।

কণ্ঠ ৫: আর আমি? আমি কবি—মাঝে মাঝে টলে উঠি,

আমূল কেঁপে যাই, যেমন কেঁপেছিলাম সেই টোয়েন্‌টিয়েথ কংগ্রেসের পরে, ক্রুশ্চফ-বয়ানের বর্ণনে। তবু বেঁচে আছি কী প্রকারে? টলে উঠি, তারপরই আরও জোরে আঁকড়ে ধরি। মাটি কাঁপে? এই বয়সে নতুন মাটি আর পাব কোথায়, তাই ফিরে আসি, ওই মাটিতেই ধপ্‌ করে বসে পড়ি।

কণ্ঠ ৬: আমার কেমন মাথার গোলমাল হয়ে যায় সেই বাষট্টি সনে। ফিরে এসেছি আমিও। সেরে গেছি। এখন শুধু মাঝে মাঝে শোধনবাদের বাতের ব্যথাটা চাড়া দিলে বন্ধুদের দেখিয়ে হঠাৎ 'ওই যে ওরা, নিপাত যাক ওমুক দেশের দালালরা' বলে বিকট চিৎকার করে উঠে নিজেকে শান্ত রাখি।

কণ্ঠ ৭: ওই মিথ্যে দুর্নাম কাটাতে আমি তো চে গীভেরাকে উদ্দেশ করে একবার একটা কবিতাও লিখলাম। তবু হায়, দুর্নাম গেল না, খাতার নাম থেকেই গেল।

কণ্ঠ ৮: আমি নবনাট্য দলের প্রযোজক-পরিচালক, আমি বিশিষ্ট অভিনেতাও। প্রগতিবাদী অথচ সে-রকম বিষয়বস্তু পাই না। বারে বারে তাই সেই অবক্ষয়গ্রস্তদের দ্বারস্থ হতে হয়—সেই রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন কি পিরানদেলো, এমন-কী মারকিনী আরথার মিলারেরও। বলিষ্ঠ আশাবাদ-টাদ নিয়ে দু-চারটে নাটক লিখে বা লিখিয়ে নিয়ে চেষ্টা করি প্রায়শ্চিত্ত করতে, কিন্তু কী আফশোস, লোকে নেয় না।

কণ্ঠ ৯: আমি বুদ্ধিজীবী. কট্টর বামপন্থী। তবু সেদিন খবর পেলাম গ্রামে আমার জোত-জমি কারা কেড়ে নিচ্ছে। দৌড়ে গেলাম সেখানে, হাতে তখনকার এক মন্ত্রীর চিঠি। তিনি লিখেও দিয়েছিলেন "এটা প্রকৃত প্রগতির পথ নয়", [illegible]তেও কাজ হল না। বিশ্বাসী হয়েও সেমসাইড্‌ গোল খাওয়া—এ কি কম কষ্ট?

কণ্ঠ ১০: নাটকটাকে আপনি খেলো করে দিচ্ছেন। ওটা বিশ্বাস নয়, ব্যবসাদারি। এখানে আমরা বিশুদ্ধ বিশ্বাসের কথাই বলছি।

ওই বিশ্বাস ঘা খেলে সৎ ব্যক্তিদের বাঁচার সাধটাই ঘুচে যেতে থাকে। আমার যাচ্ছিল।

লেখক : জানি। হাঙ্গেরির পরে—

কণ্ঠ ১০ : তারপরে এই সেদিন চেকোস্লোভাকিয়ায় আগে-পরের আরও অজস্র ঘটনায়। যুগোস্লোভিয়া বনাম কমিনফর্ম, রুশ-চীন সীমান্ত বিরোধ—ছ'টি সমাজতন্ত্রী দেশ যে কখনও পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে, আগে ভাবিনি। আমার অধীত জ্ঞান, পঠিত তত্ত্বের সঙ্গে কিছু মিলছিল না। বাইরে তবু তর্ক করছিলাম, কিন্তু ভিতরটা ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে, জীবনের সাধ শূন্য হয়ে গেল। সে কী কষ্ট—সেই শূন্যতার মধ্যে মৃত্যু-বাসনা পা টিপে টিপে এগিয়ে এল, সব অবসান।

লেখক : সততার শাস্তি, সেই পরিত্রাণ। শুধু আপনি কেন, অগোচরে অবচেতনে মৃত্যুতে পেয়ে বসার আরও বহু এবং বিখ্যাত দৃষ্টান্ত। ধ্যানের ভারতবর্ষের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক রূপ যাঁর মেলে না, তিনিও অচিরে বিদায় নেন, সেখানে নিয়তি তাঁর সহায় হয়। একটি রাষ্ট্রের কাণ্ডারী সতেরো আঠারো বছর পরে যদি হঠাৎ দেখতে পান, তাঁর আদর্শ আকাশকুসুম হয়ে গেল, আন্তর্জাতিক নীতির সৌধ ভেঙে পড়ছে, তখন সভামঞ্চে একদিন ভেঙে পড়েন তিনিও—প্রাণধারণের বাসনার ভিত তলায় তলায় তার আগেই ক্ষয়ে গেছে। জগতে এইসব ঘটে—এই অভিমানী আত্মহনন, কিন্তু যে-হেতু অপ্রত্যক্ষ, তাই ইতিহাসে তা কীর্তিত হয় শুধুই মৃত্যু বলে, "আত্মহনন" কথাটি কোথাও লেখা থাকে না।*

* এই একাঙ্কিকার কপিরাইট সকলের ; অতএব অভিনয়ের জন্য লেখকের অনুমতি নিষ্প্রয়োজন।

১.

আসুন, আমরা এ-বিষয়ে একমত হই যে, যুক্তি-তথ্য ইত্যাদি হল মনের খাঁচা। একবার খুলে দিন, দেখবেন চিত্ত তৎক্ষণাৎ একটি "ওপ্‌ন-এয়ার জু"; যেখানে যত্নলালিত যতেক ধারণারূপী জীবের থৈ-থৈ নৃত্য। পলকে স্বস্তি পাব। নচেৎ দেখুন, "বিচ্ছিন্নতাবোধ" কেবল যুবা-বয়সের একচেটিয়া নয়। আমরা, প্রবীণেরাও, পরিবেশ প্রচলিত বিশ্বাস থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছি। বিচ্ছিন্নতাবোধে আমরাও আক্রান্ত।

এই রোগ যদি সারাতে পারি, দেখব আমরা প্রত্যেকেই "বিন্দুর ছেলে" গল্পের এক-একটি এলোকেশী। এলোকেশী বলত তার নরেন ভালো ছেলে, মাস্টারগুলো পোড়ারমুখো তাই নরেনকে প্রোমোশন দেয় না। আমরাও বলে যাব, আমরা বাঙালীরা সর্বাংশে উত্তম, একচোখো বাকী সকলের চক্রান্তে এবে কোণঠাসা। ব্যস, আর কোনও গোল রইল না, [illegible]গত, ঐতিহ্যগত, শ্রমশক্তিগত কোনও গলতি চোখে পড়বে না।

আমরা কারা? প্রশ্ন মাত্র তীর্থের পাণ্ডাদের মত চটপট আদি-পুরুষের নামের ফর্দ গড়গড় পড়ব। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জানেন না? অবশ্যই জানেন। খালি জানেন না, এঁদের কে এখন কোথায়। বলে দিচ্ছি: রামমোহনের যুক্তিবাদ, সন্ধান, সাহস—এ-সবের স্মৃতি মুছে গেছে, তিনি আছেন কেবল, এই ধরুন, একটি ছোট্ট সমাজের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দিতে। বিদ্যাসাগর? তাঁর দুর্গতি আরও শোচনীয়। তাঁর সমাজ-সংস্কার চালুই হল না, বর্ণপরিচয় ইত্যাদি ইদানীং পড়ি না, আর যেহেতু সংস্কৃতকে মরা ভাষা বলে

বাতিল করেছি (যদিও দেবভাষা ; কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেবতা মাত্রেই অমর নন), সুতরাং ব্যাকরণকৌমুদী প্রভৃতির কথা ওঠেই না। বাংলা গদ্যের তিনিই স্রষ্টা—স্রষ্টা না হোন, অন্তত সফল প্রথম। ও-তথ্য সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য থাক। তাঁর পৌরুষ, তাঁর চরিত্র ? দূর, ওসবের আবার খদ্দের কে, অতএব বীরসিংহের সিংহশিশুটি, আহা বর্ষায় শীতে নিথর মূর্তি, গোলদীঘিতে পর্যবসিত।

স্বামীজী নেহাত একটি শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠানের মূল প্রেরণা, তাই তুলনায় কিঞ্চিৎ ভাগ্যবান, তাঁর বাণী-টানী যদিও ভুলেও পড়িনি, দৃপ্ত সন্ন্যাসীর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে কস্মিনকালে আমল দিইনি। একটু ভক্তিতে চিটচিটে হয়ে আছি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ওয়ারিশী সূত্রে অর্জিত সম্পদ শুধু কিছু নাচ আর গান, তা-ও সেই সৌরজগতের সীমাও প্রধানত মার্জিতরুচি কয়েকটি মহল। থুড়ি, বিশ্বভারতীর নাম বলতে ভুলেছি, কিন্তু বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের আছে তো !

ব্যস, মোটামুটি তামাম-শোধ হয়ে গেল, ঋষি বঙ্কিম, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষ যদি যোগ করি, তালিকাটি এক রকম সম্পূর্ণ। জীবন-চর্যার পরতে পরতে এঁদের চিহ্ন নেই, খোঁজ মেলে এক জন্মজয়ন্তী, স্মৃতিবার্ষিকী ইত্যাদিতে, এঁরা আছেন দেয়ালে, ফটোয় সমর্পিত ফুলটুলে। বঙ্গকুলোদ্ভব সকলেই সন্দেহ নেই। সন্দেহ : এঁরা কি বাঙালী ?

২.

মেনে নিলুম তা-ই। আমাদের বহুনিনাদিত রেনেসাঁসের এরাই শাঁস। একে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই—আঠারো শতকের শেষ থেকে বিশ-এর গোড়া অবধি, এত অপরাজিত লম্বা ইনিংস খুব বেশি জাতি খেলেনি। যদিও সংশয় থেকেই যায়, এই নব-জাগরণটা এত একপেশে কেন ; কেন শুধু ফুলের বাগানটিই পুষ্পিত হল, কেন ফলের বাগিচাও দেখা দিল না। সাহিত্যের সমারোহ প্রতিফলিত

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY AGARTALA

হল না জীবনের অন্যতর ক্ষেত্রে, বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে, শিল্পবাণিজ্যের সংগঠনে কিংবা বিজ্ঞানে।

সাবধান, আত্মপ্রীতিতে গদ্‌গদ্ কেউ যেন ফশ করে শেখানো সেই কথাটা বলে বসবেন না, "জানেন না, আমরা যে ভারতবর্ষের ফরাসী ; আমাদের কলাবিদ্যাতেই আমাদের কৈবল্য।" কারণ ফরাসীদের যে ছবিটা দুনিয়ার হাটে বিকোয়, সেটা শুধু একপিঠ (কবি, রোমান্টিক, প্রেমিক এই সব আর কী) ; ওই পিকচারকার্ডের অন্য পিঠে দেখি লেখা আছে আর এক কাহিনী : শিল্পে, উৎপাদনেও ফরাসীরা বিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য জাতি ; সুপার-পাওয়ারগুলিকে বাদ দিলে, শক্তিতেও।

৩.

এ-সব যে আওড়াই, তার গোড়াতে আমাদের তোতাপাখীর মত পড়ানো বুলি। আমরা অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রগতির ধারটার বিশেষ ধারি না ; ভালাখোলের নাম ক'জন জানি? সুব্রহ্মণ্যভারতী একটি ক্ষীণ জনশ্রুতি। সাধনমার্গের প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর আর পণ্ডিচেরি পর্যন্ত বলে থেমে থাকি, কিন্তু রামন মহর্ষি কে, এটা নির্ঘাত একটা জামাইঠকানো প্রশ্ন, ভাগ্যিস বাসরঘরে শালিকারা একালে বরকে বিশেষ নাকাল করে না।

ব্রাহ্মসমাজ? নিশ্চয়, কিন্তু "প্রার্থনা সমাজ"? সেটা আবার কোন্ বস্তু? কেন না, মহারাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ওই শিবাজীর পিরিয়ড পর্যন্ত, পন্‌জাবে তো রণজিৎ সিংহের পরে আর এগোইনি। ধন্য টড্, তাঁর কল্যাণে রাজস্থান তবু তো পৌঁছতে পেরেছে মুসলিম-যুগে ; নইলে রাজস্থানীদের তো পেটমোটা মারোয়াড়ী বলেই জানি— যে-কোনও ব্যঙ্গচিত্র বা প্রহসন সাক্ষী। সাঁটের ভাষায় সরদারজীরা বাঁধাকপি।

কালোবাজারের কালিতে মারোয়াড়িদের একটি অংশের হস্ত হতে

পারে লিপ্ত, কিন্তু দোকানদার-অফিসার-ঠিকেদার সমেত আমরা সবাই বুঝি যুধিষ্ঠির! ওই 'ইতি-গজ' মার্কা শঠ অপপ্রচার অপরকে অপমান ততটা নয়, যতটা আপনাকে ঠকানোর সুড়সুড়ি। ওঁদের কেউ-কেউ নিশ্চয় ভেজাল দেন, ভুয়া শেয়ারের লেনদেন করেন। বাণিজ্যে প্রাধান্যের প্রসাদে সে-সুযোগ এদের বিলক্ষণ আছে।

তবু ভুলেও কেন মাথা চুলকে ভাবি না, এই আধিপত্য এল কোথা থেকে, ব্যবসা, শিল্প বেহাত হল কেন। পলাশী বাংলা দেশে এবং পরে কলকাতা অবশ্যম্ভাবীভাবে রাজধানী নির্বাচিত, এই সুবাদে ইংরাজের উচ্ছিষ্ট বেনিয়ানমুৎসুদ্দিগিরির দৌলতে এ সুযোগ তো বাঙালীই প্রথম পেয়েছিল। তবু কেন কারবারের পর কারবার উঠল লাটে, এত ব্যাঙ্কের গণেশ ওলটাল? কার্যকারণ জিজ্ঞাসা একটি শব্দব্রহ্ম আবিষ্কার করে নেবে—তার নাম 'শ্রম"। অন্যের গর্হিত কুকীর্তি দেখে কেন ভুলে থাকি আমাদের ঘাটতি।

অতীতকেই বা ভুলি কেন। কেন বিস্মৃত হই ভারতের ঊষরতম একটি প্রদেশকে, যেখানে প্রকৃতি সর্বৈব প্রতিকূল, তখন ঘাসও প্রায় গজাতে চাইত না। সেখান থেকে প্রাণ ও প্রতিষ্ঠার সন্ধানে একদিন লোটাকম্বল নিয়ে দলে দলে বাহিরিয়া এল যারা, হয়ত আজকের রাজস্থানীদেরই পিতামহ বা প্রপিতামহ তাঁদের শ্রমশক্তি, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতাকে কেন স্মরণ করি না? প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞাই এঁদের একদিন ছড়িয়ে দিয়েছে দেশের দূরতম প্রান্তের কোহিমা থেকে কুমারিকায়, আজ যারা ছড়ানো গঞ্জে গঞ্জে, ঠাট্টা করে যাদের বলি "কাঁইয়া"। সিন্ধী, পনজাবী, গুজরাতীদের সম্পর্কেও কথাটা অল্পবিস্তর সত্য। পলাশীর যুদ্ধ বরং একটা ঐতিহাসিক অ্যাক্‌সিডেণ্ট বা আকস্মিকতা, কিন্তু ওই আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প একটা আকস্মিকতা না।

দেখুন, মগজের দাম ঢের, কিন্তু জাতি-গড়ায় কায়িক শ্রমের দামই কি কম? একে আমরা বরাবর তুচ্ছ ঠাউরে এসেছি। তার প্রমাণ আমাদের সমাজের মজ্জায় মজ্জায়। হিসাব করুন, যারা হাতে কাজ

করে, তাদের একটি শ্রেণীও কি উচ্চবর্ণের? তারা কথ্য ভাষায় নাপিত, ছুতোর, কামার, চাষা, মাঝি, মিস্ত্রী ইত্যাদি মাত্র। আজ বড় জোর ঠেলায় পড়ে এঁদের সংস্কৃত নাম দিয়ে একটু সমীহ করছি, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রবণতার কি বদল হয়েছে? দেখে তো মনে হয় না। ধরুন, এই কলকাতা শহর। এখানে পাখার তলায় আয়েসে বসে তৈলরসে স্নিগ্ধ আবেশে কাজ হয় আর কতটুকু, ঘরের বাইরে, পথে, ময়দানে যত সারাই, মেরামত বা তৈরী করার কাজ—উন্মুক্ত আকাশের নীচে রৌদ্রে বর্ষায় যত ঘর্মাক্ত কর্মকাণ্ড, সেখানে বঙ্গভাষী ক'জন দেখতে পান? কিছু পাবেন স্টেটবাসে. অল্পস্বল্প ট্যাকসিতে। নতুবা যারা রাস্তা খুঁড়ছে, ঠেলা ঠেলছে, মাল বইছে, ময়লা তুলছে, জ্বালাচ্ছে আলো, বসাচ্ছে পাইপ, বাঁশের ভারায় চড়ে ইমারত গেঁথে তুলছে, প্রায় সববাই বহিরাগত, বিভাষী, অন্য প্রদেশবাসী। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত হেঁটে যান, ফিরে এসে হাতে গুণে আমাকে জানাবেন ক'জন বঙ্গীয়কে মাঠে-বাটে সর্ববিধ ক্রিয়াকর্ম কায়িক শ্রমরত দেখতে পেলেন—এই আমার চ্যালেনজ রইল।

অমনোহারী কিন্তু উপকারী

১.

পাঠ্য একটি কাব্য থেকে পণ্ডিত মশাই কবে একটি সদুক্তি পই-পই পড়িয়েছিলেন, যার অর্থ "একই সঙ্গে যা উপকারী এবং মনোহারী" এমন বচন দুর্লভ (আগে হলে ওষুধের উপমা দিয়েও ব্যাপারটা বোঝানো যেত, কিন্তু এই ক্যাপসুল আর ট্যাবলেট-এর কালে, তেতো ওষুধ কাকে বলে তা একরকম ভুলতে বসেছি)।

উপকারী আর মনোহারী কথা যে বস্তুত সোনার পাথরবাটি, এই উক্তিটি মনের ছাঁচে একেবারে তক্তির মতন বসে আছে। আর এই মুহূর্তে আমার ডট পেনটার ঘাড়ে ভর করেছে। কারণ জাতি হিসাবে আমাদের চারিত্রিক কয়েকটা দুর্বলতা, বিচারের প্রমাদ আর সিদ্ধান্তের ভ্রান্তির কথা ভাবতে বসেছিলাম।

আমরা অনেক শোনা কথাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে নিয়ে নিই নির্বিচারে, আর জাগতিক যে-কোনও বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে আমাদের প্রত্যুৎপন্ন উত্তর জিহ্বাগ্রে জিন-দেওয়া ঘোড়ার মত সদাই প্রস্তুত। শেষ উত্তরটি জানা তো আছেই, তদুপরি শেষ মতামত দেবার অধিকারও, ধরে নিয়েছি আমাদের। কথাটা প্রত্যয় না হয়, চায়ের দোকান থেকে অফিস-ক্যানটিনে এক চক্কর ঘুরে আসুন, চমৎকৃত চক্ষুকর্ণ টের পাবে, সৌরলোক-তলে হেন সমস্যা নেই যা জলবৎ তরল না হয়ে যাচ্ছে। দেখবেন, যিনি নিজের নাবালক পুত্রকেই হয়ত বাগ মানাতে পারেন না, তিনি কত অনায়াসে গোটা দেশের প্রশাসন চালাচ্ছেন। অর্থাৎ তাঁর হাতে ভার থাকলে সব কেমন বিলকুল ঠিক চলত, সে বিষয়ে মসৃণ বাচন। পণ্ডিত নেহরু কিংবা বিধান রায়, মহাত্মা গান্ধী থেকে ইন্দিরা গান্ধী—প্রত্যেকের প্রতিটি ভুলচুক

আর গলতি এঁদের মুখস্থ এবং নখদর্পণে। বলতে পারেন, আপনিও তো দেখছি সেই দলে মশাই, সবজান্তা-গিরির তুবড়ি ওড়াচ্ছেন। কসুর কবুল! নিজেকে বাদ দিয়ে বলছি না, এই বান্দা সকলের সঙ্গে নিজেকেও দাঁড় করিয়েছে কাঠগড়ায়।

২.

যেমন একদা ইঙ্গবঙ্গীয়েরা সাহেবদের বিষম ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম, এখনও যে-ই যতটা পারি সে-ই ততটা সাহেবিয়ানা করে থাকি। কিন্তু মুখে— হয়ত-বা মনে-মনেও— প্রায় সবাই সাহেবদের উপর হাড়ে-হাড়ে চটা। সে ভালই। দেশাভিমান? সে তো অতীব উত্তম। কিন্তু খতিয়ে দেখা যাক, সাহেব কারা। সামান্য ব্যতিক্রম এবং বর্ণসঙ্করের অল্প-স্বল্প নমুনা বাদ দিলে বলা যায়, যারা ইউরোপীয়, অন্তত মূলত ইউরোপীয়, তারা।

এইবার যদি প্রশ্ন করেন, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সমৃদ্ধিতে, জীবন যাপনের মানে ইউরোপ অগ্রসর কেন, চটপট উত্তর দেব, "ওরা যে সাম্রাজ্যবাদী জানেন না! সারা দুনিয়া শোষণ করে দস্যুরা দৌলতের পাহাড় বানিয়েছে।"

আপনি যদি সন্দিগ্ধ হন, কথাটার উপর উখো ঘষে নেবেন। হয়ত বলবেন, "সাম্রাজ্য? ঠিক। কিন্তু সাম্রাজ্য ছিল কয়টি ইউরোপীয় দেশের? ব্রিটেন—ইয়েস; ফ্রান্স—ট্রু এনাফ; পর্তুগাল তথাস্তু; স্পেন?—একদা খুবই রবরবা ছিল অতএব মানতে রাজী আছি। না-হয় আপনাকে পাইকারী-খুচরো আরও কয়েকটা নাম মনে পড়িয়ে দিচ্ছি: লিখে নিন হল্যানড, বেলজিয়ম, এমন-কী ডেনমার্ক, আর ইতালী। অটোমান তুরস্ক, আর জার-শাসিত রাশিয়াও জুড়তে চান?—আচ্ছা। ভাবলেই বুঝবেন, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ঠিক এই ফর্দে পড়ে না, আর ইতিহাসের হলদে পুঁথি ঘেঁটে গ্রীকদের নিয়ে টানাহেঁচড়া করবেন না। না-হয় আরও দু'একটা বাদ-সাদ গেল্ই—

কিন্তু তারপর? সাম্রাজ্য যাদের গেছে, কিন্তু এখনও তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছে; সেই কয়টি বাদ দিলেও ইউরোপে পড়ে থাকে আরও ডজন-ডজন দেশ, তাদের বেলা? কোথায় কস্মিনকালে সুইডেনের ছিল সাম্রাজ্য? কিংবা সুইজারল্যানডের? শিল্পে সম্পদে এরা কেন প্রধান, স্বাচ্ছল্য কেন উপচীয়মান?"

ঘন ঘন কেশে তখন আমি বলব "ক্লাইমেট······বুঝলেন কিনা, ওসব দেশের এমন চমৎকার ওয়েদার—"

দোহাই আপনার ওই মুহূর্তে হাত তুলে আমার সব বাচালতাকে থামিয়ে দিন। বলুন যে, ইউরোপের বৃহত্তর ভাগ ঘর্মাক্ত নয়, একথা ঠিক। কিন্তু আবহাওয়া দিয়ে পুরো প্রশ্নটাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনুরূপ শৈত্য মিলবে দুনিয়ার বিস্তর মুলুকে; ধরা যাক আমাদের উত্তরে হিমালয়ের ক্রোড়ে নেপাল ইত্যাদি যে তিনটি দেশ। কই, আবহাওয়া তাদের উত্তীর্ণ করে দেয়নি তো সাফল্য আর আত্মশক্তির কোনও শিখরে?

ঘোর তার্কিক আমি বলতে পারি "ওরা আকারে ক্ষুদ্র"। আপনি তৎক্ষণাৎ বলুন, "ইউরোপেরও বহু দেশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।" যদি বলি, "কিন্তু জনবল?" আমার মুখের উপর জুড়ে দিন আদমসুমারির পরিসংখ্যান।—"জনবলেও ইউরোপের বহু দেশই বলীয়ান নয়। এত অল্প যে, মা ষষ্ঠীর নেকনজরের দেশের মানুষ আপনি অবাক হবেন শুনলে।"

সুবিধাবাদী আমি তক্ষুনি ওই কথাটায় একটা ছিদ্র পেয়েছি ধরে নিয়ে ছোবল দিতে চাইব। বলব, "আরে, তাই তো বলছি। আমাদের এখানে জনসংখ্যার জাঁতার চাপ, হেঁ-হেঁ-হেঁ, পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা—"

নিরস্ত করুন আমাকে। বলুন, "জনতার ঘনতা ইউরোপেরও কোন কোনও অঞ্চলে বিলক্ষণ। সেটা যদি তাদের বৈষয়িক ব্যবস্থায়, অন্নবস্ত্রের সংস্থানে দুর্বহ ভার না হয়ে থাকে, সে কৃতিত্ব তাদের।

বস্তুত ক্যাথলিক ঐতিহ্য সত্ত্বেও প্রাগ্রসর প্রায় কোনও দেশেই জন-সমস্যা আজও একটা সমস্যাই হয়ে ওঠেনি। ক্যাথলিক ঐতিহ্য সত্ত্বেও কোন-কোনও দেশ—যথা ফ্রান্স—যদি দীর্ঘকাল "তিষ্ঠ" বলে জন-স্ফীতিতে ঠেকিয়ে সংখ্যাটাকে মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড় করিয়ে থাকে, সেটা কৃতিত্ব তাদের।

"আর প্রকৃতির কথা বলছিলেন? প্রকৃতি শীতল হলেই সর্বদা যে মনোরম, তা-তো নয়! ওই মহাদেশের বৃহত্তর ভাগের সঙ্গে ভুলে যাবেন না সূর্যের সম্পর্ক ভাদ্র-বৌ-ভাসুরের (অবশ্য সেকালের)। বছরে অন্তত ছয় মাস সে যে কী দুঃসহ করুণ, না দেখলে ধারণা করা যায় না। সেই প্রতিকূল প্রকৃতি তখন এই নিষ্ঠুরা অত্যাচারী, এই আবার অন্ধ অথবা মৃত—আপাদমস্তক কুয়াশার শবচ্ছদে আবৃত। আজও এত দিগ্বিজয়ী কাণ্ডের পরও, প্রতি বছর কনকনে তুষার-ঝড় ওই মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত হিস-হিস চাবুকে চাব্‌কায় ঘরবাড়ি, খেতখামারের উপর অকস্মাৎ পড়ে পুরু বরফের কঠিন পাত —বিবরণ পড়েননি? বীজ ছড়ালেই সোনা কোনও মন্তরে ফলে না। তবু তারই মধ্যে সে তার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, জীবনাসক্তিকে সমুত্থিত রেখেছে।"

৩.

নিজের বাক্যচ্ছটায় ঈষৎ লজ্জিত আপনার অবশ্যই একটু দম-নেওয়া প্রাপ্য হবে। এক ঢোক জল খেয়ে শ্রান্ত গলায় ফের বলতে শুরু করবেন "দেখুন, আপনি সাম্রাজ্যের কথা বলছিলেন। শোষণ, অত্যাচার, লুণ্ঠন, সবই ঠিক। হেন মানবিক অপরাধ নেই যা শ্বেতাঙ্গ জাতি নানা মঞ্চে অনুষ্ঠিত করেনি, হেন লাঞ্ছনা-অপমান নেই যা হতভাগ্য ঔপনিবেশিক দাসত্বে বদ্ধ জাতির পর জাতির অদৃষ্টে জোটেনি। তার কোনও সাফাই নেই, ক্ষমাও আছে কিনা জানে মাত্র মহাকাল। কিন্তু ভুলবেন না, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে যেমন

নিধনাস্ত্রের সৃষ্টি—দোষ বিজ্ঞানের নয়—তেমনই অসংখ্য অশঙ্ক পথিকৃৎ আর দিশারী মানুষের কীর্তির উপস্বত্ব ভোগ করেছে এক-একটি রাজশক্তি। যে অস্থিরতা, দুর্বার চাঞ্চল্য অভিযাত্রী মানুষকে ঠেলে দিয়েছে অজ্ঞাতের সন্ধানে, কত অথৈ সমুদ্রে জাহাজডুবি, কত রোমাঞ্চিত অরণ্যে অন্বেষণ আর অবগাহন, দুস্তর মরু পরিব্রাজনা, দুর্গম গিরি-লঙ্ঘন—সেই পরমাশ্চর্য প্রাণশক্তিকেই শ্রদ্ধা জানাতে বলছি, আর তার উৎস কোথায়, লুঠেরাদের নারকী কাহিনীকে ধিক্কার দিতে দিতে সেই সন্ধানেও রত হতে যেন ভুলে না যাই। দধীচির পঞ্জরাস্থি দিয়ে তৈরী হয়েছে শোষণের বজ্র, কিন্তু দধীচিকে নমস্কার করব না কেন? মিলিয়ে পাঠ নিলে আমাদের সার্থকতার রাস্তারও হয়ত একটা হদিশ পাব।"

আঁতকে উঠে আমি বলব "কী সর্বনেশে মতলব দিচ্ছেন আপনি! ওরা ভোগবাদী, অর্থচিন্তা বৈ পরমার্থের কথা তিলেক ভাবে না। তা-ছাড়া ভেবে দেখুন, আমরা যখন সুসংস্কৃত সভ্য জাতি, ওরা তখনও ছিল জড়, বর্বর—"

হাত তুলে আপনি কি তখন বলবেন "আস্তে?" বলবেন কি যে "কবর খুঁড়ে কফিনের ঢাকনা তুলে তুলে দেখা পণ্ডশ্রম। যা ছিল, তা নেই। যা আছে তার খোঁজ নিন। দেখুন, ইতিমধ্যে কালচক্র আবর্তিত হয়েছে। কবে কার কী ছিল তার খবরে আজ কী হবে। বিশ্বমঞ্চে বেশ কিছুকাল নায়ক ইউরোপ। দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম মহাদেশ প্রতাপে-প্রভাবে কিসের জোরে বৃহত্তম হয়ে উঠল, সেই রহস্যের সন্ধান নিতে বলছি। যদি বলেন, খাস ইউরোপের সেই মহিমা তো আজ প্রায় অস্তমিত, তখন দেখিয়ে দেব আজকের রাশিয়াকে, আমেরিকাকে; আগামীকাল কানাডা আর অস্ট্রেলিয়াকে—এরা প্রত্যেকেই প্রধানত ইউরোপীয় শোণিতাস্থিসম্ভূত। নিজে ক্লান্ত, অংশত ক্ষয়িত সেই—মহাদেশটি অন্য রূপে আছে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরাজ করছে।

"আর ভোগবাদী বলছিলেন না? ওটাও শোনা বুলি। গ্রহের এক পিঠ দেখে সবটার কল্পনা। ইউরোপের সামগ্রিক জীবনের ভোগও নিশ্চয় একটা দিক, সেটাও তার উচ্ছল, পরিপূর্ণ প্রাণেরই প্রকাশ এবং প্রতীক। না, স্ট্রিপটিজ আর নাইট ক্লাবই তার সর্বস্ব না। তারই একাংশ সাধনাতেও সন্নিবিষ্ট—যেন বহুকোণ একটি কাঁচের গোলকে রৌদ্র প্রতিহত হয়ে আলাদা আলাদা রঙ নিয়ে ফিরে আসছে। এক কারুকৃতি ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে তারই অন্যরূপ চিত্রপটে মূর্ত দেখি, সঙ্গীতেও সেই মূর্চ্ছনা। শুনেছেন ইউরোপীয় সঙ্গীত? তার হালকা দিক তো ফিল্মী গানে গানে সাত নকলে আসল খাস্তা, কিন্তু ওদের যে গান ধ্রুপদী? কখনও প্রবল, কখনও করুণ, কখনও লাস্য, কভু ঔদাস্য, তটিনীর কিঙ্কিনী, বনের মর্মর, সমুদ্র আলোড়ন, ঝড়ের স্বনন—একটু মগ্ন হয়ে শুনলে কখনও কি মুগ্ধ করেনি? ওদের বিজ্ঞানের কথা জানি। যে অফুরন্ত উদ্ভাবনী বুদ্ধি ওদের বিজ্ঞানে, সেই উদ্ভাবনী ওদের কাব্যে নাটকে কাহিনীতে। শিল্প কলার অশেষ প্রকরণে।"

হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বলব "কিন্তু আমাদের দর্শন"—মৃদু হেসে আপনি বলবেন, "সেই বেদান্ত উপনিষদের কথা বলবেন তো? ষড়দর্শন? তপোবন আশ্রম-টাশ্রমের যুগ অতিক্রান্ত হবার পরে বলুন তো ভগবন! ক'টি দর্শন আপনারা রচনা করেছেন? টীকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যা আর সারাৎসার ছাড়া। দেশীয় যত পণ্ডিতের দার্শনিকরূপে প্রসিদ্ধি, তাঁদের অবদান কী? সঙ্কলন, চর্বিত-চর্বন। তাঁরা অবশ্যই পণ্ডিত, যেহেতু সকল দর্শন-শাস্ত্র করেছেন অধ্যয়ন, কিন্তু দার্শনিক নন। এই হেতু যে সমাজ-সংসার অর্থনীতি, বিশ্বের তাৎপর্য ও নিয়ম সম্পর্কে নূতন কোনও সত্য তাঁদের ভাবদৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, নূতন কোনও তত্ত্ব জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে উপহার দিয়েছেন ক'জন? ইউরোপের দর্শন-চিন্তার খবর নিতে কিন্তু শুধুই প্লেটো আর পিথাগোরাসে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন নেই—শতকের পর শতক জুড়ে স্কুলের পর স্কুল, একালেও এমন দশক কমই আছে, যা ভাবনার

রাজ্যে নতুন আলো ফেলেনি, তত্ত্ব-প্রসব আজও অবিরত, অরতি-বিরত। আদিকালে লাওৎসে-জরথুস্ত্র, যীশু-মহম্মদ-বুদ্ধ প্রভৃতি সকলেই যেমন প্রাচ্যদেশীয়, একালেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এলাকায় প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন যাঁরা, যথা মারকস, ফ্রয়েড অথবা আইনস্টাইন—সবাই পাশ্চাত্ত্যদেশীয়।

"বিজ্ঞান? ওটায় পাশ্চাত্ত্যপ্রাধান্য অবশ্য চক্ষু লজ্জার খাতিরে ইদানীং স্বীকৃত, পুষ্পক রথ কিংবা টিকিতে ইলেকট্রিসিটি-ঘটিত গালগল্প-কল্পনায় যাঁদের অচলাভক্তি, তাঁদের হিসাবের বাইরে রাখছি। আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক, কেননা যে যাঁর বিষয়ে যাবতীয় গ্রন্থ ও থিয়োরিতে পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু মৌল কর্ম? আহা-হা বিরল ব্যতিক্রমগুলির উল্লেখ করবেন না, তাঁরা নমস্য, এবং সাধারণ বন্ধ্যাত্বেরই প্রমাণ। কারও কারও তো নিজের কুঞ্জে কোন্ বসন্তে কোকিল গান গেয়েছিল, সেই কুহু-কুহু রব স্মরণ করেই বাকী জীবন কেটেছে। উপরন্তু আত্মপ্রতারণাও আছে—জে সি বোসের আবিষ্কারের দৈ মার্কনি নামে এক নেপো মেরেছে, এই বিকৃত মিথ্যাটা আমাদের ছাত্রদের শেখানো হয়েছে।"

"বাকী রইল একালের শিল্পকলা। সাহিত্যের কথা বলবেন তো? মহাজনদের নাম স্মরণ রেখেই বলছি, অসামান্য কৃতিত্ব এখানে দেখা গেছে সত্য, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি, পরিধির সঙ্গে তুলনা করলে সে মারাত্মক রকমের কিছু না। প্রথমে তো বড় রকমের কাজই হয়েছে খুব কম। দ্বিতীয়ত আছে অনুকরণ, যার পোশাকী নাম দিয়েছি 'প্রেরণা'!"

"ব্যাপারটা কী জানেন? আমাদের কলে-কারখানায় যেমন বিদেশী নোহাউ, আমরা হয় "অ্যাসেমবল করি নয়ত মেশাই—" আমাদের সাহিত্যেও অনেকটা তাই: স্বীকরণ আর মিশ্রণের চমৎকার নমুনা। হায়, এই তালিকা থেকে বহু পূজ্যপাদ গুরু-মহাগুরুর রচনাও বাদ যায় না।"

*　　　*　　　*

অবশেষে এই কথা বলে আমি যতি টেনে দিতে চাইব : স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি মহাশয়! আপনি হাঁপাচ্ছেন। আর বলবেন না। আপনার কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একটু অতিরঞ্জিত করছেন নাকি?

আপনি হাসবেন। বলবেন "করছি"। গুরুত্বপূর্ণ অংশটা যেমন বড় হরফে ছাপি, তেমনই সাফ-সাফ কথাগুলোও একটু বাড়িয়ে একটু বড় গলায় বলি। আত্মসমালোচনায় দোষ নেই, যদি শোধ-রানোর তাগিদ থাকে। আয়না সামনে রেখে ক্ষৌরী-কার্যের মত। আত্মপ্রত্যয় ভাল, কিন্তু আত্মোন্নতির জন্য আপনার যোগ্যতার বাস্তব আর যথাযথ মূল্যায়ন একই রকম জরুরী। অন্যের সঙ্গে মেলালে তবে নিজের খুঁতগুলো চোখে পড়ে। "ওরা কিছু না" বলে সবাইকে নস্যাৎ করা চলে না। একই মনস্কতা থেকে আমরা একে মেড়ো, ওকে খোট্টা, তাকে পাঁইয়া বলি। অন্যকে ছোট করার 'মূলে মাথায় ছোট বহরে বড়', সেই হিং-টিং-ছট হাস্যকরতা আর ভাঁড়ামি। নিজেদের ঈশ্বর-নির্বাচিত জাতি ঠাওরানোর মূর্খের স্বর্গ রচনা—এবং হতাশা। তখন চক্রান্ত কল্পনা করে চিৎকার আর শিহরণ। চতুর্দিকে এই দেখছি।"

এই বলে আপনি নিজেই বুঝি বলবেন, "যাক, এক দিনের পক্ষে একটু কড়া ডোজ হয়ে গেছে। দরকার হয়ত এ-সবের জের আর একদিন টানা যাবে।" আর নিষ্ক্রান্ত হবার আগে আপনি কি সুর করে একটি পদ্য পড়ে যাচ্ছেন? "আমাদের দেশ ভাই, পারো কি চিনিতে? সব ছোট, আমি বড়ো / আমাকেই পূজা করো / এই কথা সেইখানে পাইবে শুনিতে।"—বোধ হয় মানকুমারী বসুর। আপনি চলে যাবার পরও লাইন ক'টা শুনছি, আর লেখাটা শেষ করে দেখছি বহু বিস্মিত, স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ মুখের সারি।

"মাক্সি" কাজও চাই

১.

কান মলছি, কসম খাচ্ছি, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' আর *না। বঙ্গদার্শনিক কচ্‌কচির মানে তো এই যে, সকলে যখন* কুহুরবে বুঁদ, তখন কা-কা স্বরে ডেকে ওঠা, যোগনিদ্রা চট করে কিছু ছুটছে না।

ওই মাটির কেল্লার বাসিন্দা আমিও ছিলুম, টের পাইনি যে, তার দেয়ালগুলো ভুল মশলায় তাল-তাল কাদার গাঁথা। যেমন, দেশটা স্বাধীন করল কে?—একমাত্র বাঙালী। দাম দিল কে?—খালি বাঙালী, আবার কে। ইত্যাদি সুখেপাড়া ধারণাগুলি মনের নীড়ে দিব্যি তা পাচ্ছিল, তারপর মোহের উপর হঠাৎ একদিন মুগুর, খোসাকুসুম সমেত ডিমটা ভেঙে গেল। তৎকালীন প্রামাণিক বিবরণগুলি বলে দিল, এমন অঞ্চল নেই যে লড়াইয়ে সামিল হয়নি। আমাদের একটা প্রধান ভূমিকা ছিল বৈকি, কিন্তু প্রাধান্যের অর্থ সর্বস্বত্ব না। দাম দিয়েছে আরও অনেক মুলুক তবে দিতে গিয়ে দেউলে হয়েছে একমাত্র বাংলা। এটা ঠিক!

এ-ও ঠিক বাংলা দীর্ঘকাল ছিল অগ্রণীও। তার একটা হেতু, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে আমাদের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা (শুধু কি খেতাবে রাজা আর ব্ল্যাক জমিন্দারেরা! মহা-মনীষীরাও বাদ যান না) গোড়ায় ব্রিটিশ শাসনের সর্ব-মঙ্গলামঙ্গল্য রূপ ভজনা করেছেন (সিপাহী বিদ্রোহকে বঙ্গসন্তানেরা তাই ভাবলেন সব ঝুট হ্যায়, তফাত রই), বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পরে চৈতন্য হল মা-জননী মহারাণীর ওই রূপ সর্বার্থসাধিকা নয়। প্রসাদের উঞ্ছে অরুচি এল, তাঁর সঙ্গে ইউরোপের উনিশ-শতকী লিবেরাল শিক্ষা-দীক্ষা যুক্ত হল। ঝড়

যেখানে আছড়ে পড়ে আগে, সেখান থেকেই আগে সরে যায়। আহত বঙ্গ-মানস ফনা তুলল।

তিক্ততা ক্ষোভ অন্যত্রও তৎপর মাথা তুলছিল নিশ্চয়ই, যথা মহারাষ্ট্রে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বৈঠক যে বোমবাই-এ বসেছিল সে কি একটা হঠাৎ-ঘটনা একটা ভূঁইফোড় ব্যাপার? গুজরাটে গান্ধী-অভ্যুদয়ও নয়।

আন্দোলনের নাটকে বড় পার্ট নেবার জন্যেই ইংরাজের নেক-নজর হারাই, আমরা কথাটা বলে থাকি বটে, কিন্তু বিবেচনা করুন, ইংরাজ বিদায় অবধি বাংলার আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশেষ কমেনি। যদিও কলকাতা থেকে রাজধানী অপসৃত হয়েছিল, তবু ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়া বহু ক্ষেত্রেই বাঙালীর ছিল প্রতিপত্তি। কলকাতা, আমাদের সাধের কলকাতা, জলা থেকে যে একদিন জেগে উঠেছিল, সে ক্রমশ ডুবতে থাকল জলাতে। এখানে যে ভ্যাকুয়াম প্রত্যক্ষ করলাম, কই বোমবাই, দিল্লি, মাদ্রাজ কি বাঙালোরে তা দেখা গেল না তো। ডাইনীর কুনজর ছাড়া অন্য কারণও যে থাকতে পারে, খতিয়ে দেখিনি। বোমবাই প্রভৃতি স্থানে ট্র্যানজিশন বা পর্বান্তর যে মসৃণ হল, তার কারণ এই শহরের স্থাপনা যার হাতেই হোক, এর বৈষয়িক ভিত্তির আর সমৃদ্ধির একটা বড় অংশ ছিল স্বদেশীয়দের। সৃজনে না হোক, লালনে তারাও হাত লাগিয়েছিল। কলকাতা কার? জোয়ার কেটে গেলে দেখা গেল, কলকাতা ছিল সাহেবদের, অচিরে মারোয়াড়িরা সে শূন্যস্থান পূরণ করল। আর, কলকাতা বাদে তখন বাঙালীর যা সম্বল সেটা তিন-সাতে একুশের পরে হাতে-থাকা পেন্‌সিলের মতো।

একটা হেতু দেখাবেন, পার্টিশন। সর্বনাশ তো নয়, অর্ধনাশ। তা দিয়েই কি গোটাটার ব্যাখ্যা সম্ভব? বিভক্ত তো হয়েছে বিশ্বের আরও কত এলাকা, যথা পানজাব, দূরের জারমানি। রাষ্ট্রিক অভিশাপ কোথাও সার্বিক দুর্গতি আনেনি। যদি বলেন 'ওটা

পক্ষপাত' কথাটা পুরোপুরি মানব না। পুনর্বাসন-ব্যয়ের পরিসংখ্যান বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয় ঠিকই, কিন্তু বড় রকমের কোনও হেরফেরের সাক্ষ্য পেশ করে না। পানজাবী বা সিন্ধীদের তড়িৎ-পুনর্বসতি শুধু সুয়োরানীর বরাত নয়। আর এক জাদু তাদের উদ্যমেও নিশ্চিত নিহিত ছিল।

আজও অর্জিত বিদেশী মুদ্রার অনেকটাই যোগায় পূর্বাঞ্চল, কিন্তু সে উপেক্ষিত, তার পাওনা পকেটে আসে না, ঠিক। এই অবিচারকে লঘু করতে চাই না, কিন্তু প্রাপ্যকে ছিনিয়ে নিতেও সমবেত সংহত প্রতিজ্ঞা লাগে। অব্যাপারেষু কত ব্যাপারে এত দন্ত-কিড়িমিড়ি কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা দেখি কই! ফলে হাওড়াকে অভুক্ত রেখে ফেঁপে উঠছে লুধিয়ানা, এর পিছনে সম্ভবত কেন্দ্রীয় কারসাজি। কিন্তু বিশেষ করে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিই শুকিয়ে যাচ্ছে কেন, কী করে আমাদের ওষুধ-প্রস্তুতির প্রাণকেন্দ্র মহারাষ্ট্রে সরে গেল তার নিরাসক্ত ময়না-তদন্ত আবশ্যক বোধ করিনি। সেই প্রচলিত প্রবাদটিই মনে পড়ছে—বিধাতা যাদের হনন করবেন, আগে তাদের বুদ্ধি হরণ করেন। এই প্রজন্মের আমরা সেই প্রজাতি।

২.

প্রজাতি, না জাতি? আমরা কী-জানি, বোধ হয় নিজেদের আলাদা একটা জাতিই ভাবি। বাংলার ব্রতকথায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছিলেন, "বাংলা নামে দেশ," সেই সংস্কারটাই খাঁটি। মুখেও আলগা ভাবে বলি "বাংলা দেশ।" আপনাকে যদি অন্যের আপনার করে নিতে না-পারি, তবে অন্যেই বা আমাকে আপন ভাববে কেন!

যে কারণেই হোক, সর্বভারতীয় ধারায় আমরা কোনও দিনই গা ঢেলে দিতে পারিনি, যার গালভরা নাম "নন্-কনফরমিজ্ম"। অর্থাৎ আমরা ভিন্নগোঠ। যথা সম্পত্তির ব্যাপারে সকলের মিতাক্ষরা,

আমাদের দায়ভাগ। আমাদের নব্য-ন্যায়, স্মার্ত রঘুনন্দন, ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক দৃষ্টান্ত। স্বাতন্ত্র্যকে বাহবা দিতে পারতাম। যদি সেটাই একমাত্র চিত্র হত। কিন্তু হায়, আত্মসমর্পণ আর গ্রহণেরও যে অঢেল নিদর্শন। যথা, আমাদের ভাষা উত্তর-ভারতীয় গোষ্ঠীর, যদিও আমরা নহিক আর্য। মহাকাব্য দু'টিকে মাথায় রেখেছি, যদিও নাকি এই মুলুক ছিল পাণ্ডববর্জিত! বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে এখানকার গোঠে-মাঠে চরাতেও বাধেনি!

কথাটা অতএব না-গ্রহণ, না-বর্জন। এবার বিবেচনা করা যাক্ ভারতীয় ইতিহাসে আর সংস্কৃতিতে আমাদের স্থান কোথায়, অবদান কী! সেখানে দেখি উত্তর বা পশ্চিম ভারতের কথা ও গাথাই আমাদের (নব্য-আবিষ্কৃত কিঞ্চিৎ গীতিকাদি বাদ দিলে) প্রধান উপাদান। রবীন্দ্রনাথ কি ডি এল রায়কে ছুটতে হয়েছিল মেবারে কি পানজাবে—দেশাত্মবোধের উৎস সন্ধানে। রমেশ দত্তকেও তাই। বঙ্কিম কিছু বাড়ালেন, কিছু-বা কল্পনায় সাজালেন, তবু বিধির নির্বন্ধ, রাজসিংহের দ্বারস্থ হতে হল তাঁকেও। সরলার্থ :—উদ্দীপক প্রাক্-ইতিহাস যথেষ্ট ছিল না।

প্রত্যয় না-হয় পাঠ্য ইতিহাসের পাতাগুলোই না-হয় ওলটান। ভারতের ইতিহাস (ব্রিটিশপূর্ব যুগে) প্রধানত উত্তর-ভারতেরই ইতিহাস, অংশত দক্ষিণেরও, পূর্বাঞ্চল ক্বচিৎ-চকিৎ তড়িতের মতো ঝিলিক মেরেছে। বিস্তর সাধ্য-সাধনায় পালযুগের খবর একটু-আধটু মিলেছে বলে মানরক্ষা, ওটা গ্লোরিয়াস। শান্তিপুর-নদে অবশ্যই বানে ভেসেছে, সে অনেক পরে। বৈষ্ণবকাব্য মধুর ও অনবদ্য, কিন্তু মীরার ভজনও কম না। আর সন্ত তুকারাম, কি কবিরের দোঁহার তো বিশেষ খবরই রাখি না।

এবার সঙ্গীত। কীর্তন কিংবা বাউল গানে আমারও চিত্ত হু-হু করে, কিন্তু এ-ও জানি প্রকৃত মার্গ সঙ্গীতের শিকড় "পচ্ছিমা"-দেরই মুলুকে, শাখা-প্রশাখা সেখান থেকেই বিস্তারিত।

এতেই যদি আঘাত পান, তবে তো স্থাপত্যের কথা তুলবই না। ওরও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছড়ানো দাক্ষিণাত্যে কিংবা উত্তরে মুসলিম জমানার ভগ্নাবশেষে, আমাদের সবেধন নীলমণি গৌড় আর আদিনা। যদি কেউ বলে, বিশেষ আর কিছু কেন নেই? প্রত্যুৎপন্ন প্রত্যুত্তর দেব—"এখানে পলিমাটি যে, কিছুই থাকে না।" ফীচার-রাইটারেরা অবশ্য বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মন্দির-টন্দিরও দেখাবেন, কিন্তু কবুল করব না যে, ওগুলো ওড়িশার কীর্তিগুলির পাশে গ্রামসুবাদে পাড়াতুতো ভাই মাত্র; "এমনটি আর পড়িল না চোখে আমার যেমন আছে", কবির স্ত্রীর এই গদ্‌গদ প্রতীতি এ ক্ষেত্রে খাটে না।

চিত্রপট? কালীঘাটের ড্যাবডেবে প্রোফাইলগুলি বড়াই করে আমরা টুরিস্‌টদের দেখাই বটে, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, ও-বস্তু সত্যই কি নিপুণে-নয়নাভিরাম অঙ্কন? রিভাইভ্যালিজ্‌ম-এর মোহে যেন ভুলে না যাই কোন্‌টা উৎকৃষ্ট কোন্‌টা উৎকট। রাজপুত কিংবা মুঘল স্কুলের শৈলী তুলনা করুন, য়ুরোপকে না-হয় নাই টানলাম। অজন্তা বা ইলোরা বৃহত্তর বঙ্গের চৌহদ্দির ঢের যোজন বাইরে।

৩.

ব্যাকুল আর্তস্বর শুনছি "পরে কহ আর। আমাদের রেনেসাঁস!" অতিশয় উপাদেয় অপিচ সুশীতল তাহে সন্দ নাই, কিন্তু অধুনা পুরাতন ঘৃত। গৌরবের মধ্যাহ্নের পর ধূসর গোধূলি দেখি মাত্র। চলচ্চিত্রে যেহেতু সত্যমেব জয়তে, সুতরাং আমাদের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। তবু গুরুত্বে সংস্কৃত আর ইতিহাস চর্চাও ঊনমাত্র ন্যূন নয়। পণ্ডিতেরা হলপ করে বলতে পারবেন, ওই দুই বিষয়ে বারাণসী আর মহারাষ্ট্র কত উচ্চ পীঠস্থান। সংস্কৃতি-সতীর কোনো কোনো দেহ-অংশ তবে কালীক্ষেত্র ছাড়া অন্য মুলুকেও পড়েছিল!

সাহিত্যে অবশ্য আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত। আলবৎ। তাতে হায়, কিছু প্রমাণ হয় না। এ এক দুর্বোধ প্রহেলিকা যে, বারবার দেখা যায়, দুর্গন্ধ সারে যেমন সেরা ফসল, প্রতিকূল পরিবেশেও তেমনই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ফলে। দৃষ্টান্ত জার-আমলের রাশিয়া ; দৃষ্টান্ত উনিশ শতকের বাংলা।

কিন্তু প্রকৃত প্রাণ তো প্রাচুর্যে হবে উচ্ছিত, বিস্তারিত। প্রমাদ গণি সেখানে অবক্ষয় দেখে। ক্ষেত্রও ক্রম-সঙ্কুচিত। শিক্ষকতায়, চিকিৎসাবিদ্যায়, ব্যবহারজীবিকায় যে-জাল একদা ছিল বিস্তারিত, তা গুটিয়ে আসছে। বশংবদ কলমনবিশিতে যে শ্রেষ্ঠত্ব, সেখানেও তামিল আর অন্ধ্রবাসীরা বাগড়া দিতে বাড়িয়ে আসছে। এর পর যখন হঠাৎ পড়ি গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণে বাংলার স্থান অনেকের পিছে, সাক্ষরতায় অন্তত পাঁচ-ছয়টি রাজ্যের নীচে, তখন দেখি অন্ধকার। ভূত তো ভূত-ই, জ্যান্ত যে ভবিষ্যৎটাই !

অথচ আমি আশাবাদী। উদ্ভাবনী শক্তি আজও যে অনিঃশেষ, নিয়তই তার প্রমাণ পাই। যে উদ্ভাবনী বিচিত্র পথগামিনী, নতুন কিছু করার হঠাৎ হঠাৎ তাজা আলোর ঝলক, কিন্তু তার বেশি কি ? যথা, মুক্ত মেলা, ময়দানে 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-আড্ডা কিন্তু তাতেই কি সত্যিকার বাঁচার এক নতুন রাস্তা খুলে গেল ? আবার 'নখাগ্রে নক্ষত্র, যেন জিনিবারে পারে'—কেউ হয়ত গোটা একটা কবিতা লিখে ফেললেন নখে, কেউ পোস্টকার্ডের পিঠে কপি করলেন এক-অধ্যায় গীতা, প্রায়ই এ-সব দেখি, অসামান্য সেই নৈপুণ্য বাখানি, কিন্তু মোটমাট ফলটা কী, জগতের কোন্ হিত সাধিত হবে তাতে ? কাঁকড়ার দাঁড়া নরম পাড় খুঁড়ে খুঁড়ে দিব্যি এক-একটা গর্তে ঢুকে পড়ছে। তার নাম ক্ষুরধার মেধা। এ-সব আমরা খুব পারি। দৈনিক হয় না, তবু 'দৈনিক কবিতা' প্রকাশের মৌলিকত্ব আমাদেরই এবং এদেশে যত 'লিটল ম্যাগাজিন' তার বারো আনাই যে বের হয় বাংলায় এই স্ট্যাটিসটিকস অণুমাত্র অবিশ্বাস করি না। সাবাশ। তবু লক্ষ্য

করবেন, সবই 'লিটল', বৃহৎ কোনও সৃজন কোথায়? হালে-ছাপা 'মিনি-বুক' আর 'মিনি-পত্রিকা' হাতে পড়লে তাই এক চিমটে নুন দিয়ে চাখি। 'পত্রাণু' দিব্য বস্তু, এ সব আণবিক কারুকৃতিতে চিরকাল জানিই তো যে, আমাদের মাথা সার্ফের মতো সাফ। কিন্তু ছোট-ছোট কসরতে কি বড় কাজ হয়। কড়ে আঙুলের খেল তো প্রবল প্রাণের প্রমাণ নয়, কব্জির জোরটাও একটু পরখ করি। সনেট-টনেট ঢের হল, এবার আস্ত একটা কাব্য লিখলে ক্ষতি কী? মিনি-টিনি খাসা বস্তু, এবার "ম্যাক্সি" কাজও চাই।

কুতবমিনার থেকে
কলকাতা, তোমাকে

দূর দিল্লিতে বসে তোমাকে এই চিঠি পাঠাচ্ছি কলকাতা, কুতবমিনারের চূড়া থেকে শহীদ মিনারে 'আজান'-এর ডাক পাঠানোর মতো।

এইমাত্র আর্যাবর্তের হৃদয় ভেদ করে পৌঁছলাম রাজধানীতে, সারা রাত্রি সারা দিন রেলকামরার কাচঘরে বন্দী, যেখানে রাত্রিশেষ সেখানেই উত্তরপ্রদেশের শুরু ; এ-পথে আমি বারবার গিয়েছি, কৃপণের মতো সময় বাঁচাতে ইদানীং প্রায়ই ক্ষিতি ছেড়ে ব্যোমারূ হতাম—ঠকতাম। চেনা চিহ্নগুলি আজ নতুন করে চেনা হয়ে যাচ্ছিল। —সেই সবুজ আর সোনার অহরহ লুকোচুরির অবাধ প্রান্তর, অড়হর আর সরিষার চষা অফুরন্ত জমি, যার সর্বাঙ্গে ডুরে ডুরে হলুদ ফুল—ফুল কিংবা টুনটুনি পাখি ; পাখি কিংবা ঝরে-পড়া অজস্র তারা—যেন সবে গতকাল যার গাত্রহরিদ্রা হয়ে গেছে সেই বধূটি। আর ?

আর অরঘট্টে আবদ্ধ অবোধ বলীবর্দ ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে ক্ষেতে জলসিঞ্চন করে চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ এক-একটা মুখটি-তোলা উট, অকস্মাৎ-বিস্মিত ছত্রভঙ্গ বক-সভা, মাঝে মাঝেই আমার কাছে বেনামী স্টেশনের পর স্টেশন ; যেখানে ডাকগাড়ি দাঁড়ায় না, বরাবরই দেখেছি সেই বিবর্ণ স্টেশনগুলি উপেক্ষিত বিকালে কেমন আহত-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। দু'টি বিপরীতমুখী ট্রেন একরোখা ঝোঁকে পরস্পর ঝটিতি পাশ কাটিয়ে তীরের মতো ছোটে। তবু ওই দোয়াব অঞ্চলে, যার উত্তরে গঙ্গা দক্ষিণে যমুনা ফাঁকে ফাঁকে এই যন্ত্রযুগেও দেখা যায় সারস, কদাচিৎ ময়ূর কিংবা মায়ামারীচ হরিণ। গাঁইতির কাজ মুলতুবী রেখে ট্র্যাকের গ্যাংম্যানেরা একটু সরে চেয়ে থাকে, পরিচিত গাড়ি, চেনা চলচ্ছন্দ তবু প্রতিটি ট্রেনই একটি নিরন্তর বিস্ময়।

আল্‌পথে যে বউটি দেহাতী স্বামীর পিছে ছায়ার মতো চলেছে, চোখ তুলে চকিতে একবার তাকাবে সেও, কেননা স্থির যে, তার কাছে গাড়ির গতি দূরের প্রতিশ্রুতি।

আমি, এক্‌সপেন্‌স অ্যাকাউনটের নকল নব্য বাবু, বাতানুকূল কক্ষে যেন সুরক্ষিত একটি প্রকাণ্ড মাংসখণ্ড, মৃদুহাসি মধুরভাষী রেল-অ্যাটেনডেনট-এর আপ্যায়নে আপ্লুত, দেখছি প্রসারিত-কর একটি ভিখারীকেও। মাঝখানে পুরু কাচ, ওই ভিখারী আবছায়া একটি অঙ্কনের মতো; আমি ওর নাগালের বাইরে। এই আন্দোলিত গাড়ির জানালায় বসলে মনে হয়, বাইরের প্রকৃতির পটখানিকে কে যেন ওষুধের শিশির মত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। আসলে ওটা ভ্রান্তি। কাছের দূরের আলোসমেত দিগন্তের দৃশ্যাবলী নির্লিপ্ত, স্থির; চলন্ত ট্রেনটাই দোলায়মান, কম্পিত।

এই কম্পিত অনুভূতি প্রতীকের মতো তুলে ধরে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রতীতি, যা আশ্বস্ত। এত অভিযান, নব-নব কত নির্মাণ, আপাত-পরিবর্তনের মধ্যে তার মূল সত্তা সমাহিত, আত্মস্থ।

এইসব প্রলাপের অর্থহীনতায় আক্রান্ত আমি যখনই প্রক্ষিপ্ত হই রাজধানীর ক্রোড়ে, প্রগলভ এবং বিলাসিনী রাজধানী, তখনই তোমাকে মনে পড়ে কলকাতা! তুমিও যে একদা রাজধানী ছিলে— সেই প্রাক্তন কথা ও কাহিনী আজ এই পশ্চিম মুলুকে ক'জনের মনে আছে? আজ তা পুরাবৃত্তের মত প্রোথিত, শুধু বুঝি আমাদেরই স্মরণে সঞ্চিত। আমরা ভুলতে পারি না।

তুমি আমাকে আজও মর্মরিত করো, কিন্তু, কলকাতা, তোমাকে আজ আর আমি কল্লোলিনী মনে করি না। ঘূর্ণি তুমি এখনও ঠিকই, কিন্তু ঘোলাজলের ঘূর্ণি। অথবা পলি-পল্বলে আকণ্ঠ। বেশ কিছুকাল তোমাকে এইমত দেখি: দুঃখিনী, শ্রীহীনা। তোমার শ্রী কবে গেল?

অথবা যায়নি, যা ছিল তাই আছে, বদলে গেছে আমারই চোখ—মাঝে মাঝে এ-ও ভাবি। পূর্ববঙ্গের যে-শিশুটি একদা শিয়ালদায় দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হত, তার সেই ঘোর কৈশোরেও কাটেনি, সে তোমাকে দীন-হীনা ক্রম-জীর্ণা কবে থেকে দেখতে শুরু করল? তোমার রূপ-রস, গন্ধস্পর্শের মোহ তাকে যে প্রথমে গ্রাস করেছিল তার কারণ কি এই যে, মফঃস্বলের সেই বালক তার আগে কোনও মহানগরী ছাখেনি? বহুদিন অবধি তার কাছে তুমিই ছিলে অনন্যা, একমাত্র। তোমার ছটা, তোমার প্রাসাদ, তোমার পিচে-বাঁধা পথের বিনুনী, পেট্রোল-পোড়ানো হাওয়াগাড়ি। একটি গ্রাম্য মনকে, অভিজ্ঞ রমণী, তুমি গড়ে পিটে নাগরিক করে তুললে। তারও পরে, বলেছি তো, সেই বালক ছিল মূলে পূর্ববঙ্গীয়; রাষ্ট্রিক বিধানে, রুজির গরজে, মার কোল ফেলে বরাবর সে মাসির আদরেই রয়ে গেল।

কিন্তু নানা ধান্দায় তাকে যত্রতত্র ঘুরেও বেড়াতে হয় যে! যৌবন-কালের অনেকখানি বেলা তো এই দিল্লিতেই বয়ে গেছে। অবশেষে অবশ্যই সে ফিরে গেছে তোমার কাছে, কিন্তু ইতিমধ্যে সে দেখেছে দেশ, বারেবারেই নানা বিদেশ, তাতেই কি তার মাথা ঘুরল? সে তুলনা করতে শিখল কিনা! সেই হল তার কাল, বিলেত-টিলেত তো দূরস্থান। তোমায় পাশে রেখে যখন ছাখে বোম্বাই, কি বাঙালোর; দিল্লি কি মাদ্রাজ, তখন প্রথমে জ্বলে হিংসায়, পরে তোমার কাছ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয় অভিমানে। কঙ্কালসার জরাজীর্ণ কলকাতা, তুমিও কি সীতার মতো পাতাল-প্রবেশ করবে?

*

তুমি কোপনস্বভাবা, তুমি দিল্লী-প্রাসাদ-কূটের দুঃস্বপ্ন, বিপ্লবের জন্য তলে তলে তৈরী হচ্ছ এ-কথা যারা বলে, তারা মিথ্যা কথা বলে। আমি তো দেখি এক সর্বংসহা মাটির মূর্তি, রোষে-ক্ষোভে, উপেক্ষায়-অবহেলায়, ঘৃণায়-বেদনায় যা বিদারিত হয় না। বছর কয়েক আগে সাল্‌কের হাড়গোড়-ভাঙা রাস্তায় বাসে-কি-গাড়িতে চাপলে

অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসত। দেখতে দেখতে গোটা শহর আর শহরতলির সবটাই কি সাল্‌কে হয়ে গেল? বেলঘরিয়া-টালা, হালতু-বেহালা ইত্যাদি মহল্লায় মহল্লায় জল-কাদা আর অকথ্য বীভৎসতার সঙ্গে মানুষের ভয়াবহ যে নিত্যসহ-বাস, একটি অগ্ন্যুৎপাতের পক্ষে তা-ই ছিল যথেষ্ট। তোমার বেশির ভাগ রাস্তাতেই আলো উহ্য বা টিমটিমে, তাই তুমি না-হয় রাতকানা। কিন্তু দিনমানেই তখনও কি তোমার অঙ্গের দগ্‌দগে ক্ষত তোমাকে জর্জর করে না! জানি, দেশ হিসাবে ভারত দরিদ্র, কিন্তু এ-ও দেখেছি যে, ভারতের যেটা সামগ্রিক চিত্র, বাংলার পক্ষে তা সত্য না, আবার এই রাজ্যেরও যথার্থ প্রতিচ্ছবি, কলকাতা, তুমি কিন্তু তুলে ধর না। শুধু তোমার পরিবহণের অপ্রতুলতা আর অব্যবস্থা যে-কোনও শীতল মস্তিষ্ককে ক্ষিপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

*

আর আমরা? প্রতিবাদ নেই, নেই সত্যকার সুস্থতার জন্য আগ্রহ। অনেকে ধরেই নিয়েছি মহানগর মাত্রেরই বুঝি চেহারা এ-ই হয়। কথায় বলে, যে যা 'ডিজার্ভ' করে, সে তাই পায়। আমরাও ডিজার্ভ করি এই রৌরব-নারকীয় দুর্দশা। আমরা সর্বতোভাবেই এই কুরূপা নগরীর নাগর হওয়ার যোগ্য।

কলকাতা, তুমি কিচ্ছু বিশ্বাস কোরো না। তোমাকে নিয়ে নিষ্ঠুর একটা ঠাট্টা চলছে। নিত্য-নূতন পরিকল্পনার মিঠাই চোখের সামনে তুলে ধরে তোমার আশাকে লালায়িত করা কর্তাদের একটা মজা, কিছু না করার অছিলা। সুতরাং যদি শোনো, চক্র-রেল, মনো-রেল, পাতাল-রেল হবে, বিশ্বাস কোরো না। কমপোজিট স্টেডিয়াম? কোনদিন হবে না। দমদম থেকে ময়দানে হেলিকপটার? তার আগে ওরা ট্রাম আর বাসগাড়ি সরাক না। পারকিং মিটার—নেভার। সুপার হাইওয়ে নামে যে-বস্তুটা পেয়েছ, সেটা চূড়ান্ত ইয়ারকি। হয়

ওরা সুপার হাইওয়ে কাকে বলে জানে না, নয় জেনেশুনে তোমাকে ঠকাচ্ছে।

ডঃ রায় ছাড়া তোমাকে নিয়ে বড় মাপে কেউ ভাবেনি। নেতারা না, নাগরিকেরা তো নয়ই। আমরা কেউ পদ্মার ওপার থেকে আসতাম, বাস করতাম মেসে, মাসের শেষে মাসোহারা মনি-অর্ডার করে পাঠাতাম। আর ছিলাম উইক-এনড্ প্যাসেনজার। আর যাঁরা কালনার বা নদীয়ার, তাঁরা তো ডেইলি কমিউটার—নিত্য ঘরমুখী। বহিরাগতদের দরদের কথা না তোলাই ভালো।

অথচ কলকাতা, তুমি নাকি আমাদের সংস্কৃতির ধাত্রী, প্রাণকেন্দ্র আমাদের রাজনীতিরও। ফরাসীদের কাছে প্যারিস যা, আমাদের কাছে কলকাতা তা-ই—কথায় কথায় বলি। ওটা ডাহা মিথ্যে। প্রতিটি ফরাসী তার প্যারিস নিয়ে গৌরব করে, প্যারিস তার আপনার। আর আমরা? শুনে শিহরিত হয়ো না, ভালোবেসে তোমার কাছে কেউ আসিনি, এসেছি গরজে। স্বার্থে। জীববিশেষ যেমন আহার্যের খোঁজে মুখ দেয় ডাস্টবিন্-এ, আমরাও তেমনই জীবিকার সন্ধানে জড়ো একটি আস্তাকুঁড়ে, আস্তাবলে।

আজ নয়াদিল্লিতে বসে তার জৌলুস দেখে হিংসায় জ্বলছি—আর অনুতাপেও। নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের সাহিত্য বলি, সংস্কৃতি বলি, রাজনীতি-অর্থনীতি সবকিছুকে পিলসুজের মত তুলে ধরে আছে কলকাতা; যে আমাদের এত দিন বাঁচিয়ে রাখল, চুঁইয়ে-পড়া তেলকালি ছাড়া, বিনিময়ে আমরা—যারা নেতা অথবা দাতা, বিষয়ী এবং বণিক, অধ্যাপক তথা চিন্তাবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক কিংবা শুধুই নাগরিক—বিনিময়ে আমরা সেই ধাত্রীকে কী দেব, কী দিতে পারি: কিচ্ছু দিয়েছি কি?

ওহ্ ক্যালকাটা

"ওহ্ ক্যালকাটা!" চল্‌তি কা নাম যেমন রেলগাড়ি, এক ইংরেজী সিনেমায় স্ট্রীটকারের নাম "ডিজায়ার", তেমনই "ওহ্ ক্যালকাটা" একটা রগরগে বিদেশী নাটকের নাম।

বেছে বেছে, আহা, আমাদের এই শহরটাকে ওরা শিরোনামে স্থান দিয়েছে। শুনে এই লেখক প্রথমে রোমাঞ্চিত হয়েছিল! নাম-পরশনে তার ঐছন দশা হল যে, মূর্ছা যায়-যায়। তত্ত্ব-তল্লাশ নিতে গিয়ে কিন্তু চোখ চড়ে গেল কপালে, ক্রোধে প্রথমে ধক্‌ধক্ করে উঠেই নিবে গেল লজ্জায়, অপমানে।

"ওহ্ ক্যালকাটা" নাটকটির সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক নাকি নামেই, আসলে নামমাত্রও নয়। এঁদো গলির আড়ংধোলাইয়ের নাম কখনও-কখনও "প্যারিস লনড্রি"—দ্যাখেননি? নাটকের নামে ওই অনাসৃষ্টিটিতে শুনেছি ডাহা নগ্নতার প্যারেড, বে-আবরু যৌন-অভিচার। তবে অযথা বেচারা কলকাতাকে নিয়ে এত টানাটানি কেন? 'সে বীভৎসা' ঠিক। রহস্যের ব্যাখ্যাটা একটা হিং-টিং-ছট। বীভৎসা, জুগুপ্সা, বিভীষিকা, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা ইত্যাদি যা-কিছু কুৎসিত, নাটকটির রচয়িতার বিচারে তার সব কিছু নিহিত ওই "ক্যালকাটা"-রূপী ক্যাপ্‌সুলে। ক্যালকাটা বললেই নাকি সব বলা হয়ে যায়। অর্থাৎ এই নগরী আজ যেখানে এসে ঠেকেছে, তাতে সে কুরূপতার প্রতীক মাত্র, কলকাতা আজ ক্লেদগ্লানির অনুষঙ্গিণী।

আসুন, আমরা সবাই মিলে খুব রেগে যাই, যেমন রেগে গিয়েছিলাম একদিন "মাদার ইনডিয়া" কাণ্ডে মিস্ মেয়োর উপরে; পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিয়েছিলাম আর-একটা খিস্তিওস্তাদ বিভারলি নিকল্‌স্‌কে। "ভারডিক্ট্ অন ইনডিয়া", মনে পড়ে?

শাপ দেব না তো কী, ওরা নরদমার ইন্‌স্‌পেক্টর যে। ওদের খোতা মুখ ভোঁতা করতে চেয়েছি পাল্টা-খিস্তির হোজ্‌পাইপ খুলে।

কী বলছেন আপনি? ড্রেন সাফ করলে আরও সহজে ওদের মুখ বন্ধ করা যেত? দূর মশাই, আপনি আবার কোত্থেকে এক সি-আই-এ-র দালাল এলেন। যারা বিশ্ব-ব্যাংকের খয়রাত নিয়ে এই শহরের চেহারা ফেরাতে চায়, আপনিও দেখছি, সেই দলে। দেশটাকে বিদেশীর কাছে বাঁধা দেওয়ার, বেচে দেওয়ার চক্রান্ত। আমাদের নরদমা আছে তো আমাদের আছে, ওদের কী। রেতে মশা, দিনে মাছি, আর মিছিল নিয়ে বেশ আছি। আসুক না ব্যাটারা ছ্যারারারা বলে তাড়াব। টি-ভিতে কেউ কলকাতার জঞ্জালের ছবি তুলছে?—এক ধাক্কা আউর দো।

অতীব পবিত্র এবং নৈকষ্য কোপ, সন্দেহ কী তায়। লজ্জালেশের খাদটুকু পাবেন না। পেলে কিন্তু মনে হয়, জিনিসটা গিনি সোনা হত। বিদেশী ক্যামেরাম্যানেরা দূর হোক, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনা-ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতিও দূর হলে সোনায় সোহাগা হত না?

ক্যামেরা না-হয় কাড়া গেল, কিন্তু মুশকিল, কলমটা কাড়া যায় না। যে যা ছ্যাখে, ফিরে গিয়ে তাই ঝর্ঝর লেখে। আমাদের চোখরাঙানিকে কা-কস্য পরোয়া। ছবির চেয়ে কালিতে রঙ চড়ানো বরং আরও সহজ হয়।

*　　　　*　　　　*

কলকাতা, যে সকলকে শুধু দিয়ে গেছে, প্রতিদান পায়নি। তার রাহুগ্রাসের শুরু কবে? ঠিক ঠিক বলতে পারব না, পুরনো পঞ্জিকা রাখিনি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা অবশ্য একটি পাচ্ছি—দিল্লি দরবার। রাজধানী কলকাতার গৌরব-শশী দূর পশ্চিমে অস্ত গেল।

ছয় দশক আগেকার কথা। সেদিন কতখানি গেল সে-কথা বলতে পারেন আজ যাঁরা অন্তত অশীতিপর, সেই প্রাচীনেরা; সাবেকী

আমলের শালগুলি রৌদ্রে মেলে দিয়ে চমৎকৃত হয়ে চেয়ে থাকার মতন।

পূরাবৃত্তের সেই পর্ব এই লেখকের অ-জানা। লাটসাহেবের বাড়ির পশ্চিম দিকে লালবাড়ীটা ছিল ভারত সরকারের বড় দফতর, লোকমুখে এই কথা শুনেই সে একদা আত্মহারা হত। হ্যাঁ, জমকালো নাম ছিল ওটার—"ইম্পিরিয়াল সেকরেটারিয়েট"।

ইম্পিরিয়াল—ইম্পিরিয়াল, অধুনা ৺গয়াপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এম-পায়ারের কলকাতাই তখন "সেকেন্ড সিটি" ছিল কিনা! তাই সেকালের কলকাতার হরেক জিনিসেই ছাপ ছিল "ইম্পিরিয়াল"। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, আরও কত কী! ইম্পিরিয়াল কিংবা রয়াল। পরে অবশ্য ওগুলোর বেশির ভাগই মুছে ফেলেছি। "ন্যাশনাল", "স্টেট", এই সব নতুন লেবেল লাগিয়েছি।

* * *

কিন্তু নামে কিবা আসে-যায়। নতুন নামে অনন্যতা কি অটুট রইল? না। ন্যাশনাল লাইব্রেরি দেশের অন্যতম মাত্র। আর স্টেট ব্যাংক? তার সদর ঘাটি পশ্চিম সমুদ্রতীরে, বোমবাইয়ে। রিজারভ ব্যাংকের কাণ্ড তো জন্ম থেকেই প্রোথিত ওই শহরেই, নানা প্রদেশে কেবল তার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত। একদিন রাষ্ট্রায়ত্ত হল জীবন-বীমা, উত্তম। কিন্তু নবগঠিত "জীবন-দীপ"-এর উচ্চতম আলোক-স্তম্ভটি দীপ্তি দিতে থাকল কোথায়?—সেই বোমবাই!

কলকাতার গুরুত্ব কতটা আছে, ভাঁটার টান লেগেছে কি লাগেনি এ-সব নিয়ে বাচাল পরিসাংখ্যিক তর্কে যাঁরা মাতেন, তাঁদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হতে আমার কিছুমাত্র রুচি নেই। আমি স্রেফ সোজাসুজি একটা হিসাব করি।

এই যে চৌদ্দটি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হল (রিজারভ আর স্টেট ব্যাংক দু'টিকে ধরলে সাকুল্যে ষোল), এর মধ্যে কলকাতায় সদর দফতর

ক'টির? মোটে দু'টির। তুলনামূলক গুরুত্ব এতেই স্পষ্ট। ওই দু'টির মধ্যে একটি ব্যাংকের সদর এখানে তো হবেই, কারণ ওটি বাঙালীর। সুতরাং হারাধনের দশটি ছেলের মধ্যে বাকী রইল একটি মাত্র ব্যাংক—যেটি বিড়লাগোষ্ঠীর। (বস্তুত, দেশীয় প্রথম সারির শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে কলকাতায় প্রধান কেন্দ্র এখনও ওঁদেরই পড়ে আছে, কত দিন থাকবে বলা শক্ত।) বিদেশী উদ্যোগের বেশির ভাগ এককালে যদিও ছিল এখানেই, নতুন বৈদেশিক উদ্যম কিংবা বৈদেশিক সহায়তায় স্থাপিত সংস্থাগুলি কিন্তু পাড়ি জমাচ্ছে অন্যত্র। পাল্লা হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকেই। লাইসেনস্-বিতরণ-কেন্দ্রের সংমা-সুলভ ব্যবহারের কথা বলবেন তো? তা তো আছেই। কিন্তু সেইটেই এক এবং অদ্বিতীয় কারণ কি না, যেন নির্জন মুহূর্তে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দেখি।

* * *

আমাদের মনে মনে একটা ধারণা, কলকাতা ছাড়া বুঝি গতিরন্যথা নেই, "এখান থেকে ব্যাটারা যাবে কোথায়!" যাবে কী, যাচ্ছে। গেছে। অন্যত্র কাঁচামালের সুবিধা কম, মজুরির হার বেশি,—তবু। মাথা-পিছু উৎপাদনের ঘাটতি, শ্রম-দিবসের অপচয়—হয়ত এমনই হেতু, কিন্তু হেতু অবশ্যই আছে।

নইলে, এত বড় বন্দর আমাদের, সেই বন্দরের কাল এত দ্রুত শেষ হয়ে আসত না। রফতানি-বন্দর হিসাবে কলকাতা এখন প্রধান, পূবে-পশ্চিমে তটরেখা ধরে অন্যান্য বন্দরও গুটি-গুটি এগিয়ে আসছে, একচক্ষু হরিণের মত সেদিকে নজর রাখতে ভুল যেন না-করি। "ফরাক্কা আর হলদিয়া হলেই সব ঠিক হো যায়েগা", এটা বালিতে মুখ গুঁজে উটপাখির অন্ধ আত্মতুষ্টি।

আমি তো চেয়ে দেখছি, রাজধানী গেছে দিল্লীতে, বোমবাইয়ের অভিকর্ষ অর্থনীতিকে টানছে। ক'টি মুখ্য শিল্প-সংগঠনের মুখ্য

কার্যালয় এখনও কলকাতায়, একবার টেলিফোন গাইড্‌-টার পাতা উলটে দেখুন না, তা-হলেই টের পাবেন। অথচ বোম্বাই যদি নিজেকে বলে "বাণিজ্যিক রাজধানী", তখন রাগ করি।

বাকী রইল কী, রাজনীতি? প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির কয়টির সদর দফতর কলকাতায়, এইবার জিজ্ঞাসা করি। রাজনীতি অবশ্য আছে, কলকাতা আর পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু ভূ-ভারতে ইদানীং সবচেয়ে মুখরোচক খবর—কিন্তু ওই পর্যন্ত। নইলে বারবার ভারতের এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে অনুভব করি, বিরাট একটি নগরীর নাম ধীরে ধীরে মুছে আসছে।

*   *   *

নিছক নামটারও যে কত গুরুত্ব, আমরা আগে খেয়াল করে দেখিনি। দমদম বিমানবন্দরের নাম বদলে "কলকাতা" করা হল, সেটা বিলম্বে হলেও ভাল। কিন্তু রেলওয়ে? আপনারা কেউ কখনও ভেবে দেখেছেন কি যে "কলকাতায়" কোনও ট্রেন আসে না, সব আসে শিয়ালদায় কিংবা হাওড়ায়। অন্তত কামরার গায়ের ফলকে তা-ই লেখা থাকে। এটা একটা আদি-ত্রুটি। কলকাতা তার প্রাপ্য প্রচার থেকে বঞ্চিত হয়—বোম্বাই, দিল্লি কি মাদরাজের বেলায় অথচ অন্য রীতি বলবৎ। সব গাড়ির গন্তব্য বোঝাতে এখন থেকে "ক্যালকাটা" ফলকটি এঁটে দেওয়া হোক, এই আমার প্রস্তাব। আসুন, এই নিয়ে একটা আন্দোলন করি।

তবে সে-ও অবশ্য বাহ্য। মূল ক্ষয়রোগের প্রতিকার কী? স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও কিন্তু এই দুর্দশা ছিল না, বাণিজ্যিক গুরুত্বে তখনও কলকাতা বোমবাই ছিল তুল্যমূল্য, তারপর থেকে কৃষ্ণপক্ষের শশিকলার মত সব হ্রাস পাচ্ছে।

রেলের প্রসঙ্গে মনে পড়ল, জোনাল বাঁটোয়ারায় কলকাতারই ক্ষতি হয়েছে বেশি—আগে 'ই-আই-আর'-এর সীমা ছিল গাজিয়াবাদ

অবধি। অর্থাৎ দিল্লির দ্বারোপান্তে। আজ কানপুর, লখনউ, এলাহাবাদ, সব ইসটারন রেলের হাতছাড়া, তার দৌড় মোগলসরাই অবধি। যুক্তি কী? সুষম বণ্টন? তা-হলে বোম্বাইয়ের বেলায় তার ব্যত্যয় দেখি কেন! জি-আই-পি বি-বি-সি-আই নতুন নাম নিয়ে প্রতিটি প্রত্যঙ্গসহ অটুট। আগে সুদূর বেরেলি কি প্রতাপগড়েও ইস্টিশনে একটি না একটি বাঙালী বুকিংবাবুকে উঁকি দিতে দেখা যেত, সেই পরিচিত মুখগুলি আর দেখা যায় না। জোনাল বিভাগের কল্যাণে বঙ্গ-সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তির চৌহদ্দি ভয়ংকরভাবে সংকুচিত। ই-বি-আর-এর কথা আর তুললাম না, পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তার তো প্রায় সবটাই গেছে। সেই সঙ্গে গেছে যাকে বলি ব্যবসায়-বন্দরের "হিন্টারল্যান্ড।" মধ্য ও পশ্চিম ভারতের গোটাটা বোম্বের করতলগত, সেটা না-হয় স্বাভাবিক—কিন্তু আসাম্ আর ওড়িশা? এই দু'টি রাজ্যও যে কলকাতা এড়িয়ে দিল্লীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগে অনেকটা পথ আগুয়ান, আমরা কি তার খবর রাখি?

দমদমের কথা তুলে আর ব্যথাটা বাড়াতে চাই না। অখণ্ড ভারতে দমদমই ছিল মুখ্য বিমান-বন্দর, অথচ ভারতীয় বিমান-সংস্থা দু'টির একটির সদর দিল্লি; বোম্বাই অপরটির। বিদেশী লাইনগুলোও আনাগোনা কমিয়ে আনছে।

* * *

আরও দৃষ্টান্ত চান? দরকার কী। বৈদেশিক মুদ্রার চৌদ্দ-আনাই আয় করে পূর্বাঞ্চল, কিন্তু তার ফল পায় মহীশূর-পানজাব-মহারাষ্ট্র। বীজ বোনে একজনে, ফসল ঘরে তোলে অন্যে। দীর্ঘ—দীর্ঘকাল ধরে এই অবিচার চলে আসছে।

তাই কী আর করব, বিষণ্ণ মনে অবগাহন করি স্মৃতিতে আর অতীতে। সেই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগল, কলকাতা জড়িয়ে পড়ল পাকে পাকে, কারণ মিত্রশক্তির যুদ্ধোদ্যমের এই মহানগরীই ছিল

প্রধান ঘাঁটি। (বিপাকে পড়ে ইংরাজেরা আবার নাকি বাংলাকে "রাইট্-অফ্" করে দিয়ে ঠিক করেই ফেলেছিল পাটনা বরাবর আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা করবে—হায়, রাজকুলের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন তো এই!)

মনে পড়ছে ব্ল্যাকআউট—অনন্ত অমানিশার সেই রাত্রিগুলি। স্লিট ট্রেন্চ, সাইরেন—মাঝে মাঝে বোমা। রাজপথে ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর, যত্রতত্র ফৌজী শিবির, নিগ্রো-মারকিন-ব্রিটিশ, জি-আই আর টমি-বয়দের হুল্লোড় আর হল্লা, কত নাইট ক্লাব, নীতিবোধ, মূল্যবোধে ধস্-নামা শুরু হল। দুর্ভিক্ষ, অবশেষে তো পার্টিশনের খাঁড়া। সব মনে পড়েছে।

লড়াইয়ের জন্য এত দাম দিল কলকাতা, তার প্রাণ ক্লিষ্ট হল, পিষ্ট হল শরীর—আজও হাড়গোড় ভাঙা রাজপথগুলো যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী—কিন্তু সেই থেকে কিছুই জোড়া লাগল না। কেউ এগিয়ে এল না প্রলেপ নিয়ে। কী করবে আর মুমূর্ষু এই মহানগরী, কী করতে পারে, এ অকৃতজ্ঞ বিদেশী প্রভুদের আর স্বদেশী নেতাদের মনে মনে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া। আর আমরা, গত্যন্তর নেই বলে যারা তার অধিবাসী? দেখছি তার সর্বাঙ্গে লেগেছে পচ, গলে-খসে পড়ছে একটু-একটু করে, নিবে এল, নিবে এল, অন্ধকার নেমে আসছে, নিমতলা আর সা'নগর ছাড়িয়ে শ্মশানের ধোঁয়া পড়ছে ছড়িয়ে, নিরুপায় আমরা কী আর করতে পারি, কুৎসিত একটি বিদেশী নাটকের নামের প্রতিধ্বনি করে সভয়ে আর্তনাদ করে বলছি "ওহ্ ক্যালকাটা"!

এই নৃত্যনাট্যে যারা
উত্তীয়

"ন্যায়-অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে"—'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে উত্তীয়ের গান। এতবার শুনেও এতদিন খেয়াল হয়নি, আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে গানটা উত্তীয়ের মুখে বসানো তার প্রতি ঘোর অবিচার। মুগ্ধ, নিষ্পাপ কিশোর, যে শুধু প্রাণ দিতে জানে,—বিনাবাক্যে দিয়েছেও—ওই কথাগুলো তার কেন হতে যাবে? যার মুখে মানায়, তার নাম রাজনীতি। কোনও নীতির সীমাকেই যে মানছে না।

"কিছুই অবৈধ নয় রণে আর প্রেমে"—এই বাক্যটিকেও এই সুযোগে বাজিয়ে নিচ্ছি। দূর! রাজনীতির পাশে প্রেম-ট্রেম নেহাত দুগ্ধপোষ্য শিশু। সভ্য জগতের যুদ্ধ তবু, অন্তত কাগজে-কলমে, মারণ-উপকরণ ব্যবহারের ব্যাপারে বৈধাবৈধ বাছবিচারের বালাই রেখেছে। প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য পাশুপাত-অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে এখনও সে ইতস্তত করে, সংবরণ চুক্তির সংযমে স্বেচ্ছায় অনেকের সঙ্গে আপনাকেও বাঁধে।

আর প্রণয়ে? সুবিন্যস্ত সমাজে কয়েকটি নিষিদ্ধ সম্পর্কের গণ্ডী সচরাচর মান্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাজনীতির ব্যবহার দেখুন। সংস্কার আর লাজলজ্জার বেড়া-টেড়া যদি থাকত, তবে আমরা অন্তত এইটুকু ধরে নিতে পারতুম যে, সমাজতন্ত্রী নব কংগ্রেস স্বতন্ত্র দলের হাত কোনওখানে চিমটে দিয়েও ছোঁবেন না, গুজরাত মন্ত্রিসভাকে পেড়ে ফেলার মতো পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের জন্যও না। উপরন্তু সমাজতন্ত্রী এই শিবিরে আর যারই হোক, রাজা-রাজড়াদের স্থান হবে না। অথবা, আদিকংগ্রেস জ্ঞাতিশত্রুদের যাত্রাভঙ্গ করতে সি-পি-এম এর প্রতি স্নিগ্ধ প্রসন্ন বয়ানে তাকাবেন না। অথবা সি-পি-আই

কোনও অছিলাতেই কোল দেবেন না মুসলীম লীগকে। অথবা জনসংঘকে। অথবা—

নমুনা বাড়িয়ে কী হবে, এ-সব বিয়ে-নিকে নিত্যই হচ্ছে, আর আমরা ইতরজনেরা তাল আর তালি দিচ্ছি। বলা যায় না, রাজনীতি আর কূটনীতি যমজভাই তো! রাজনীতি হয়ত-বা পাঠ নিয়ে থাকবে কূটনীতির কাছ থেকে। সেখানে ১৯৩৯ সনের আগস্ট মাসে হিটলারের সঙ্গে স্তালিনের পাকাপোক্ত প্যাক্ট বাঁধাবাঁধি হতে বাধেনি। ফলে নাৎসী নেকড়েরা পোলান্ডের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল সেপ্টেম্বরে—দুনিয়ার দুই নমবরের বড় লড়াই। আখেরে পারুক না পারুক, সেদিন সোভিয়েট রাশিয়া চেয়েছিল আগুনের আঁচ থেকে গা বাঁচাতে।

আসলে প্রত্যেকেই বোধহয় অদ্যতন প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে দিক-নির্ণয় করেন, দূরের দিগন্তের দিকে তাকান না। হ্রস্বদেশী বিচার মিত্রামিত্রভেদ লুপ্ত করে, উচিত অনুচিতকেও নিজ গরজের 'রাবার' ঘষে মুছে দেয়। এই হেতুই দেখি, পাকিস্তানের মোহে পিকিং মজে আছে, পিণ্ডির মন পাবার জন্যে মস্কো অধীর—

একটু দাঁড়ান, বাধা দেবেন না। যতটা একচোখো ঠাওরাচ্ছেন এই লেখককে, সে তা আদৌ না। মস্কো বা পিকিং থেকে মুখ ফিরিয়ে চাইব কোন্ দিকে, ওয়াশিংটনের পানে? তাবৎ দুনিয়ার গণতন্ত্র সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি বলে নিজেকে জাহির করে থাকে না আমেরিকা? সেই আমেরিকাকেও যখন দেখি স্বৈরাচারী আয়ুব-ইয়াহিয়ার সখা; আর পর্তুগালে সালাজারের সাঙাত; আর ইতস্তত বিস্তর পচা নড়বড়ে বাড়ির ঠেকনো—তখন ওই সংরক্ষণ সমিতিরও সদস্য কদাচ হতে পারব না, এই সার কথা অনুভব করি।

রুশ-চীনের তবু সাফাই আছে, কেন না ভারত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র নয়, সেদিকে এগিয়ে চলেছে কিনা, এই প্রশ্নও নয় সংশয়াতীত। কিন্তু ভারত যে গণতন্ত্রী—অন্তত ব্রিটিশ-মাকিনেরা গণতন্ত্রের যে-অর্থ জানে

ও মানে সেই অর্থে গণতন্ত্রী—তাতে তো সংশয় নেই। তবে আমেরিকা বা ব্রিটেন স্বৈরতন্ত্রী অপিচ ভারত-বৈরী নানা রাষ্ট্রকুলে প্রকাশ্যেই অভিসার অব্যাহত রাখে কোন্ নির্লজ্জ নীতিতে? রাখে যদি, তবে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীর ভড়ং পারছে না কেন ছাড়তে? এই রীতি আর কিছুকাল যদি চলে, তবে অচিরাৎ এই দুনিয়ার এখানে-ওখানে গণতন্ত্রের চিতার উপর উঠবে মঠ, আর সেই মঠে এঁরা বিরাজ করবেন বৈকী, দাপটেই করবেন। এঁরা হবেন মোহন্ত।

সকলের ভাব-সাব দেখি, আর মা তারাকে ডাকি। আপনি যদি আমার মতো হন তবে নিশ্চয়ই কেঁপে উঠবেন। আমার, আপনার দাঁড়াবার ঠাঁই নেই।

উত্তীয়-র কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। অসংগত কামনার অধীরতার ন্যায়-অন্যায় যে মানে না, তার নাম তবে কী? সে বোধহয় শ্যামা নিজেই। আর উত্তীয়?—আমরা। আমরা ব্যবহৃত হই, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। মরি অনেকেই। যে-হেতু তার মোহের যূপে বদ্ধ হয়ে আছি। তার, যার নাম শ্যামা। তার পরিচয় পরিস্ফুট করব না, অনুমান করে নিন। সে-ও কিন্তু একজন নয়, একাধিক। অনেক চক্র আর গোষ্ঠীর উদগ্র লালসার প্রতীকী নাম—শ্যামা। বাকী সকলে তার প্রতি আসক্তির কুণ্ডে আহুতি।

শুধু কি মোহ আর আসক্তি? হয়ত কিছুটা বিশ্বাস, আর অনেকটাই ভয়। প্রথমে বিশ্বাসের কথা বলি। যেমন, আমরা প্রায় সবাই বিপ্লবে বিশ্বাস করি। শুনে শুনে শিখেছি (১) বিপ্লব আবশ্যক; (২) বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী; (৩) বিপ্লব চিরজীবী—আর কিছু চলুক না চলুক, বিপ্লব চলতে থাকবে। ওই শব্দটার সবচেয়ে চড়া বাজার-দর। এমন কী মাঠ ফসলে সবুজ হয়ে থাকলেও তাকে "কৃষি-বিপ্লব" বলি, নইলে বিশ্বাস্য হবে না, বাজারে চলবে না। ওই শব্দটার ব্যবহারই তাই ফ্যাশন।

বিপ্লব আবশ্যক কেন? যেহেতু ইতিহাসের কয়েকটা বাছাই-করা

ব্যাপার আমাদের শেখানো হয়েছে, আমরা শিখেছি। ফ্রান্স্, রাশিয়া এই দু'টি বিপ্লবের বৃত্তান্ত গড়গড় উপরে দিই। অধুনা আর একটি নাম যুক্ত—চীন। এই কয়টি দেশে বিপ্লব সফল অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু আর যত অজস্র দেশে হয়নি? মধ্যপ্রাচ্য আর লাটিন আমেরিকা অথবা অন্ধকার মহাদেশ আফরিকার নানা এলাকা, যেখানে প্রায়ই *সকালে বিপ্লবের সূর্য ওঠে, আর সন্ধ্যা হতে না হতে অস্ত যায়*—সে-সকল অসফল, মর্মান্তিক কৌতুকের নমুনাগুলি মনেও আনি না। "বিপ্লব" শব্দটার মধ্যে অতএব কোনও মাহাত্ম্য নেই। তার সাফল্যের জন্যে অন্য কিছু লাগে—উপযুক্ত ক্ষেত্র, নেতৃত্ব এবং সর্বসাধারণের মধ্যেও সাহস, বীরত্ব, সর্বস্ব-ত্যাগের বেপরোয়া প্রস্তুতি। খানিক বাঁচিয়ে আর খানিক নাচিয়ে বিপ্লব হয় না—কোথাও হয়নি।

আবার বিপ্লবের পথে আদৌ পা বাড়ায়নি কিন্তু এগিয়ে গেছে, ইতিহাসে আর ভূগোলে তার দৃষ্টান্তই বেশি—ভূরি-ভূরি। তাবৎ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিবিধ দেশের "দেখব না, দেখব না" বললেই যা আছে, তা মিথ্যে হয়ে যায় না।

বিশ্বাসের মূলে নিহিত আছে প্রতারণাও। কাজ না-করার ঘাটতি বিপ্লব দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে—বিশেষ করে যে-বিপ্লব শুধুই "শ্লোগান", বড় জোর দু'চারটে পটকা আর পাইপ্-গান—এই আত্ম-প্রতারণা। যে-বিপ্লব তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পুলিশী হুংকারের সামনেই নেতিয়ে যায়, আর নালিশ জানায়; যে-বিপ্লব পরিচালিত হয় নিরাপদ নেতৃত্বের দুর্গপ্রাকার থেকে; যা শৃঙ্গ আস্ফালন করে, অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রভিনসিয়াল অটোনমি ফোঁপরা ক্ষমতার খড়গুচ্ছ মুখ থেকে খসে গেলে কখনও হাহাকার করে, কখনও ফোঁপায়।

বিপ্লবের আবশ্যকতা আর অবশ্যম্ভাবিতার কথা বাদ দিলেও ওই মেড্-ইজি পদ্ধতিটাও আর-একটা প্রতারণা! আমাদের কেউ বলে দেয়নি যে, ফৌজের সহায়তা এবং সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া কোথাও

সত্যকার বিপ্লব সম্ভব হয় না। এমন-কী ফ্রান্স্, রাশিয়া, চীন—এই তিনটি দেশেও না। ওঁরা "কুক-বুক" পুঁথি পড়ে রাঁধতে বসেছেন, অথচ রন্ধন-প্রণালীটাও ঠিকমত আয়ত্ত করেননি। ফলে শুধু ভাজা, পোড়া আর ধোঁয়াই বেরুচ্ছে।

এইবার বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, এই ধ্বনিটা একটু বিচার করি। কিছু গড়তে হলে আগে ভাঙতে হয়, এই সূত্রটা যদি স্বীকারও করি, তবু কেবলই ভাঙতে থাকলে আর গড়াই হয় না। সারা বিশ্বে কেউ ভাঙে না। এই শ্লোগানের জন্ম যে-দেশে, অর্থাৎ ফ্রানস, সেই দেশও কিন্তু তারপর থেকে, প্রায় দুই শতক ধরে, কেবলই গড়েছে, আর বড় রকমের ভাঙনের জয়গান গায়নি। গড়ছে, প্রাণপণে গড়ে তুলতে চাইছে রাশিয়াও—সম্ভবত সেই কারণেই সে আজ "শোধনবাদী।" আর পিকিং বৈঠক, ওয়ারশ-বৈঠক, এইসবের কোনও তাৎপর্য যদি থাকে, তবে চীনও ক্রমে ক্রমে চাইবে নিশ্চিন্তে এবং একান্তে গড়ে যেতে। গড়ে সে চলেছেও।

গড়তে চাইছি না আমরা। সংগঠনের বিকল্প, কণ্ঠে ধরে আছি বুলি। ওরা কিন্তু কাজ করে। যে-সব দেশ বিপ্লব করেনি, করবে না, তারা। যারা করেছে, তারাও। তারা বরং কাজ করে—সেখানে করতেই হয়—আরও বেশী।

আমরা উত্তীয়-রা এ তত্ত্ব জানি না। শ্যামার একমাত্র বাঞ্ছিত বজ্রসেন, তার আর-এক নাম ক্ষমতা ও আধিপত্য, আমরা শুধু সেই বাসনার বলি হয়ে আছি। তারই ইসারায়, তারই স্বার্থে "ন্যায়-অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে" গেয়ে উঠছি কেউ। কেউ-বা গণতন্ত্রের শবে পরিণত শরীরটি ছুঁয়ে ভূতের ভয়ে এবং শোকে শীতল হয়ে আছি।

দেশ-বিদেশ :
গ্রহণ বা স্বীকরণ

১.

আমাদের বড়ো অভিমান, আমাদের বিদ্বানরা সর্বত্র পূজা পান না। এই দেখুন না, সেই কবে, উনিশশো তেরো সালে, সায়েবরা এদেশের কপালে একবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ ঠেকিয়েছিল (নোবেল কমিটির চেয়ারম্যানের নান্দীমুখভাষণে ছিল "দ্য অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পোয়েট, রবীন্দ্রনাথ টাগোর", এই অফিসিয়াল বয়ানটি কজনের নজরে পড়েছে ?), তারপর—একচোখো ছোটলোক কিনা—আর ওরা এ-মুখো হল না।

ওদের নষ্টামি ছাড়া গলদ্‌ঘর্ম আমরা অনাদর-অবহেলার আর-একটা কারণ খুঁজে পেয়েছি : ভালো তরজমা নেই। যথার্থ। তরজমা হয় না সে দুর্ভাগ্য। এ অভিমান সঙ্গত। যদিও হলে কী হত বলা যায় না, আমার নিশ্চিত ধারণা, হলে লেখককুলের বিস্তর ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন। গোপনে কে কোন্ হাঁড়িতে মুখ ঠেকিয়েছেন, তরজমার ফটফটে আলোয় সেটা চট করে ধরা পড়ত। অতএব যা অভিশাপ, তাই আশীর্বাদ।

তার চেয়ে আমরা যে "প্রেরণা" নিয়ে থাকি বা থাকতুম, সেই তো দিব্যি। নমুনা নিন, ধরুন "যেদিন সুনীল জলধি" গানটি। না, না, গাইতে বলছি না, তা-হলে তো বিদেশী সুরের মৌতাতে কর্ণ বুঁদ হবে, চক্ষু বুজে যাবে আমেজে—শুধু পাঠটা মিলিয়ে নিন। "রুল ব্রিটানিয়া" গানটি মনে পড়ছে ?

তবু বোধকরি ডি এল রায় সঙ্গীতটি রচনা করতে বসে একটু মুশকিলে পড়ে থাকবেন। সুরে না হয় ট্রান্‌স্‌প্ল্যান্ট সারজারি করা গেল, ভাবটাকেও করা গেল বিদেশী ভাপে-ভরা ফানুস (এ-সব আমরা

চমৎকার পারি) কিন্তু ইংরিজী কথাগুলির বিকল্প হবে কোন্ কথা ? মূলে ছিল "ব্রিটানিয়া রুলস্ দ্য ওয়েভ্স।" সেটা লিখতে একটু ঠেকে থাকবে। সুতরাং তিনি ভেবে-চিন্তে উদ্বেলিত চিত্তে বসালেন "জগজ্জননী ভারতবর্ষ।"

হাই উঠে দুই ঠোঁট অনেকখানি ফাঁক—মূলের সঙ্গে ওইখানে বিস্তর ফারাক ঘটে গেল। ঘটনাটা এই যে, ব্রিটানিয়া তৎকালে সত্যি-সত্যিই সাত সমুদ্রে ছড়ি ঘোরাতো। কিন্তু "জগজ্জননী ভারতবর্ষ" ? সেটা নৃতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক—কোন্ নথিতে ? বহু হানাদার আর দলে দলে ভাগ্যসন্ধানীকে যুগে যুগে টেনেছে, এই সুবাদে ? বহুকে আকর্ষণ, ও-পাড়া-সে-পাড়ার সবাইকে হাতছানি শ্লাঘ্য কর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে তো মাতৃত্বের লক্ষণ বলা চলে না।

এই ঐতিহাস্যকরতা নিয়ে লজ্জা না-হয় না-ই পেলাম, কেননা গানটি উদাত্ত এবং অনবদ্য। আবেগ, অতিরঞ্জন এসব দেশাত্মবোধের কবিরাজীর অপরিহার্য উপাদান, যেহেতু আমাদের মনের সহজ গতি অতীতে এবং অতি-ত্বে। গানে তো উদাহরণ ভুরি-ভুরি। "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?"—অন্য এক কবির এই "লীডিং কোয়েশ্চেন"-এ সুতরাং বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইনি। তিনি স্পষ্টতই আর কোনও দেশের অফুরন্ত-অবাধ-অপর্যাপ্ত শ্যামলিমার কথা জানেন না। সবুজ যে কত অজস্র রকমের সবুজ হয়, সতেজ, সজীব স্নিগ্ধতা বিস্তারিত হয়ে আছে অন্যান্য দেশেরও অগণ্য প্রান্তরে আর অরণ্যে, তিনি তা দেখেননি। কিন্তু শ্রীযুক্ত ডি এল রায় তো দেখেছিলেন। তবু তিনি লিখলেন "সকল দেশের সেরা"—সেটা চাক্ষুষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, না অন্ধ গদগদ ভক্তিতে ? দ্বিতীয়টা হলে বলার কিছু নেই। তবে বেঁচে থাকলে ডি এল রায় টের পেতেন, তাঁর গানের আর-একটি কলি একেবারে বর্ণে বর্ণে ফুটে আছে : "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"—ফলেছে ঋষিবাক্যের মতো—কিন্তু একটু আলাদা অর্থে।

সম্ভব হলে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও জেনে নিতুম "চির-কল্যাণময়ী তুমি ধন্য"—ভাল। কিন্তু "দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন," এই সুখাবেশী তথ্যটি তিনি পেয়েছিলেন ইতিহাসের কোন্ পাতা থেকে ?

২.

পাঠক, ঘাবড়াবেন না আরও একটু 'শক্' দেব। আমাদের আত্মতুষ্টির কমলবন মদমত্ত করীর মত তচনচ করব।

"প্রেরণা"-র নমুনা দিয়েছি, এবার আমাদের হীনম্মন্যতার আর' একটি অভ্যাস—তুলনা। সায়েবদের দেখতে পারি বা না-পারি, বরাবর ওদের দেশ থেকে আমাদের দেশের যা-কিছু তার তুলনা খুঁজে পেতে আনি। এইভাবেই কেউ হয়েছেন আমাদের স্কট, কেউ বায়রন, কেউ বা মিলটন বা শেলি। কেউ বা বাগ্মিতায় ধুরন্ধর হলেন তো তৎক্ষণাৎ তাঁকে বার্ক বা শেরিডান বানিয়ে ফেলি। পরশ্রীতে অন্য অর্থে আমরা এতই কাতর যে, ভূগোলকেও ছাড়ি না, কাশ্মীরকে সুইজারল্যাণ্ড বলেই কি তৃপ্তি! আসামের পাহাড়ী এলাকাকেও ('মেঘালয়' নামে যার পরিচিতি) স্কটল্যাণ্ড খেতাব দিয়ে তবে আমাদের স্বস্তি। সঙ্গোপনে স্ত্রীকেও কেউ "তুমি আমার ব্রিজিট বার্দো বা মেরেলিন মনরো" বলে ফেলেন কিনা জানি না ; তালাকের অতটা ঝুঁকি নিতে আমার কিন্তু সাহস হয় না।

উপমায়, পদলালিত্যে কালিদাস যাই হোন, তাঁর রচনা দিব্যভাবে যতই উদ্বুদ্ধ হোক, নাট্যকার হিসাবে, তিনি শেক্সপীয়রের ধারে কাছেও না, সেই কথাটা ভাগ্যিস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই সেকালে উচ্চারণ করেছিলেন, এই আত্মাভিমানী একাল হলে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় জনরোষে নির্ঘাত ছাই হয়ে যেতেন। বস্তুত শেক্সপীয়র মানুষকে এত বিচিত্র দিক থেকে উদ্ঘাটন করেছেন যে, সেটা শুরু

ইস্তক আমাদের কেমন যেন না-পছন্দ, তাঁর প্রভাব আমাদের নাট্যসাহিত্যে অল্প। প্রহসনে পুরুষবেশী দু'একটা স্ত্রীচরিত্র, আর ওই যে এক বিয়োগান্ত নাটকে শাজাহানকে লীয়র রাজার ছাঁচে ঢালা— এই সব ছিটেফোঁটা বাদে শেক্সপীয়রের ছাপ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ চোখে পড়ে না, এমন-কী তাঁর সম্পূর্ণ অনুবাদও হয়নি। মানব চরিত্রের অত বিচিত্র আলোআঁধারি দিক এবং বিস্তার বোধহয় আমাদের গ্রহণের ছোট্ট করপুট ছাপিয়ে যায়। মানুষকে তার নিরাশা-উচ্চাশা, লোভ-সন্দেহ-সংশয়, কুশ্রীতা-সুষমা-সুচারুতা মিলিয়ে সর্বতোভাবে দেখার ওই সম্ভারের একটি মাত্র প্রতিতুলনা দিতে পারি—আমাদের মহাভারত। সমগ্র একটি কাল, তাঁর ব্যক্তি আর সমাজ-মানসকে বিপুলভাবে বিম্বিত করে রেখেছে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত মহাকাব্য। শেক্সপীয়রের সমাসনে শুধু বেদব্যাস—তিনি এক বা একাধিক কবি, যাই হোন্ না কেন।

৩.

ওই "জগজ্জননী" প্রসঙ্গের খেই ধরে আর-একটা চমকানো প্রশ্ন করে বসি। এ-বিষয়ে আমারও খটকা আছে। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনাটা আমাদের কতদিনের? সর্বনাশ ওটাও সাহেবদের শেখানো নয় তো!

স্মৃতিকে সাধাসাধি করে একটি উদ্ধৃতি অবশ্য পাচ্ছি—"জননী জন্মভূমিশ্চ"। একটু বিশ্লেষণ করুন, এখানে জন্মভূমিকে কি ঠিক ঠিক জননী বলেছে? জননী এবং জন্ম-ভূমি স্বর্গ থেকে গরীয়সী, বলা হল এইমাত্র। উভয়ের গরিমা সমতুল্য জানা গেল, বেশ, কিন্তু উভয়েই ধারণায় একাত্ম, এই ব্যাখ্যা একটু গা-জোয়ারি হবে। বরং পাশাপাশি পাই, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, ইত্যাদি হরেক আপ্তবাক্য। অর্থাৎ ভারতীয় মানসে ধরণী একদা ভোগ্যাই ছিল, নানা লোকাচার পার্বণ

তার সাক্ষ্য দেবে। মাটিকে নারীরূপে ভেবেছি ঠিক, রাজা এমন-কী জমিদারেরাও তো "পতি"-রূপেও কথিত, ওই উপসর্গে বিশিষ্ট হতেন। নারীমাত্রেই তো জননী নয়।

সম্ভবত দেশকে মাতা বা পিতারূপে মান্য করা, এই ঐতিহ্যটাও বিদেশ থেকে আহৃত। ইংরাজ, জরমন, রুশ ইত্যাদি জাতি স্বদেশকে ওই রূপে গণ্য করে বা করত।

সেই প্রেরণা এ-দেশের নব্যধারায় অনুপ্রাণিত মনেও আলোড়ন আনল। একজনের কথা সকলেই জানি—বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দমঠের সঙ্গীতটি তাঁর সামগান, "বন্দেমাতরম্" এই বাণীটি তাঁর মন্ত্র। আমরা বন্দনা করলাম, দেশের মাটির পায়ে মাথা ঠেকালাম। সেই নির্ঝর ক্রমশ শত সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ল বাংলা দেশের হৃদয় হতে অপরূপ-রূপা জননী মূর্তি বাহির হয়ে এল। যে-ঋণ শক্তি দেয়, আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, সেই ঋণে লজ্জা নেই, কেননা তা উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু তাকে অস্বীকার করায় নীচতা আছে।

সবারে মেলানো নিয়ে খেলা

জুতসই একটা বিষয় নেই, মাঝে মাঝে মুশকিল প্রথমত এই। কারণ, কলকাতা যদি-চ আছে কলকাতাতেই, এই লেখক কিছুকাল কলকাতায় ছিল না। ছুটির লেত্তিতে নিজেকে জড়িয়ে লাট্টুর মতো ছিটকে পড়েছিল বাইরে, অঙ্গবঙ্গের বিবিধ পথে ও প্রান্তরে। এক্ষণে ফিরে, কলকাতায় ফের কাত হয়ে পড়ে, সে হাঁপাচ্ছে। মনশ্চক্ষে ভাসছে ছবির পর ছবি—এই তো সেদিন ছিল সে ধানবাদে, তোপ-চাঁচি-মধুবনী পেরিয়ে গেল গিরিডি। পিছিয়ে এসে ঝাড়গ্রাম, টাটা রাঁচির অর্ধপথ, পতনে আর অভ্যুদয়ে ক্রমাগত যে-প্রথ, আর বাঁকে বাঁকে আকস্মিক। ধলভূমের গহনে ঘাটশিলার পরিত্যক্ত রাস্তাটি কিছুদূর আত্মহারা; পাহাড়তলির গায়ে প্রতিটি বিকালে ধোঁয়া আর অঙ্গারের বিষণ্ণ আঙ্‌রাখা—ওঠে ওঠে অথচ কোথাও যায় না, খালি জড়িয়ে থাকে। আর ডিম্‌নার নিভৃত-নীল কাকচক্ষু হ্রদ, এরই কি নাম অন্তরের অন্তঃপুর? সমুদ্রসৈকত, দীঘা—একটি চামচে টলমল অনন্ত। আবার ফিরে গিয়ে হাজারিবাগ, ক্যানারি পাহাড়ে সূর্যাস্ত, রজনীর মধ্যযামে জাতীয় সংরক্ষিত অরণ্যে সমুত্থিত ঘনিষ্ঠ উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে-চূড়ে রচিত সেই অমিত্রাক্ষর, হাতে স্পটলাইট ঘুরে ঘুরে সন্ধান করে ফিরছে কোথায় নিঃশঙ্ক নিশ্বসিত প্রাণ—সে যথার্থই এক উল্টো চিড়িয়াখানা; চিড়িয়াখানায় আমরা ওদের দেখি; আর সেই ক্ষণে অদৃশ্য শ্বাপদেরা চারপাশ থেকে কুতূহলী চোখে দেখছে আমাদের। ধূসর একটি রাস্তা ছাড়া দিশা নেই. ব্যাকুল সেই রাস্তাটা আবার অন্ধকারে যখন ঘুরপাক খায়, তখন কোথাও কিছু দৃশ্যমান নয়, শুধু কৃষ্ণপক্ষের একটাই চাঁদ এই বাঁয়ে, এই ডাইনে, এই সামনে, এই পিছনে নানা দিক থেকে দেখা দিতে থাকে।

এইসব ছবি। যা ভালো করে কোনদিন ডেভেলাপ করাও হবে না। আস্তে আস্তে একদিন মুছে যাবে। মুছে যাবে নতুন তৈরী ইন্‌ডাসট্রিয়াল শহরের বাংলোয় ক্লান্ত চেয়ারে কাটিয়ে দেওয়া সেই বিকেলটি—আধুনিক শহর, তাই সেখানে সন্ধ্যায় একইসঙ্গে ডিজেল ইনজিন-এর মোটা বাঁশি আর বিশ্বাস-সংস্কারের ধূপে সমাচ্ছন্ন করে ঘরে শঙ্খরব বাজে।

সর্বশেষে রূপনারায়ণের তীরে নউপালার সেই অতিথিশালা—দু'দিকে দু'টি গম্‌গম রেল ব্রিজ, সারাদিন সারারাত মর্মরিত ট্রেনগুলি যার উপরে অস্থির, দুর্দম, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে—অথচ।

অথচ সকাল হলেই ঘুমভাঙা চোখে দেখা যায় একটার পর একটা পালতোলা নৌকো চলেছে ভাটির দিকে। দুই দৃশ্য পাশাপাশি ঃ রেলপুলের উপরে যখন হুংকৃত ব্যস্ততা, তখনই নীচে মন্দাক্রান্তা চালে চলা নৌকো, অতি ধীরে অতি আয়েসী গতি—দেখে মনেও হয় না ওদের চিত্তে কোনও প্রকারের ব্যস্ততা বা কোনও লক্ষ্যে পৌঁছনোর কিছুমাত্র তাগিদ আছে।

*

মার্জনা করবেন, নিছক একটি সফর-সূচী সাতকাহন করে শোনাবো বলে আজ কলম নিয়ে বসিনি। আসলে শোনাবার কথা মাত্র একটাই—এত যে ঘোরাঘুরি, কিন্তু কোথাও পৌঁছনো হয়নি। ঘুরপাক খেতে খেতে ফিরে এসেছি। তবু এমন একটি নির্লিপ্ত প্রশান্তি সংগ্রহ করতে পেয়েছি যা আপাত উৎকট, বহু বিরোধী বিষয়ের মধ্যেও সমতা দেখতে শেখায়, অন্তত নানা উচ্চারণ-আচরণের হেতুটা অন্বেষণ করে।

যথা, দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক সুভাষবাদই মারকস্‌বাদ কিনা, এই নিয়ে বাদানুবাদটা। আমি মনে করি না এ-নিয়ে বিচলিত হওয়ার আবশ্যকতা আছে। তার্কিকরা তলিয়ে দেখেননি যে, ওটাই আবহমান ভারতীয় ধারা ঃ—এক ছেড়ে অন্যকে ধরা, আর যার যখন জোর

প্রতাপ তাঁকে তখন উচ্চাসনে বসানো এবং যুক্তি দিয়ে থৈ যদি না-পাই তবে ভক্তি দিয়ে গোঁজামিলানো। এইভাবেই বেদবিরোধী বুদ্ধকে এক দিন যদি অম্লানবদনে দশাবতারের দলভুক্ত করে থাকতে পারি, তবে আজ সুভাষকে মারক্‌সের ক্লাসে ভরতি করে দেব না কেন! এ আর এমন বেশী কথা কী! ট্রাডিশনটা সমানে চলছে।

তাই, যদিও আমাদের কেউ কৃষ্ণভক্ত, কেউ সদাই বলি 'কালী, কালী', কিন্তু যেই দেখি কৃষ্ণ বা কালীর একজনকেও বাদ দিলে বিপদ, তখনই চোখ বুঁজে গদ্‌গদ কণ্ঠে "আহা, যে-ই কৃষ্ণ সেই কালী", এই তন্ময় মন্ত্রজপ শুরু করি। ভয়ে ভয়ে নিজেকে ঠকাই, আর ভয় পাইয়ে দিয়ে ঠকাতে চাই সকলকে। লোকে তো ঠকেও!

গ্রামের সেই বাবার থান বা পীরের দরগা দেখেননি, যেখানে সব মামলাবাজই মাথা নুইয়ে তবে লড়তে ছোটেন আদালতে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে? কালগুণে মারক্‌স-ও বেশ কিছুকাল ওই বাবার থান, যিনি যে-পথেরই পথিক হোন। ওখানে মানত করতেই হবে। তাতে অসুবিধা ছিল না, কিন্তু স্থানীয় দেবতারাও জাগ্রত যে-স্থানে? সিন্নি চড়াতে হয় অগত্যা শেষপর্যন্ত সেখানেও। যে-কারণে সি পি এম নেতারা অধুনা নেতাজীকে তুলেছেন ইষ্টনামের লিসটিতে, হুবহু সেই কারণেই ফরওয়ারড ব্লক সুভাষকে ঠেলে দিয়েছেন মারকসের কোলে। সাফ-সাফ হিসাব, এতে আর গোল কী?

আসল হেতু, আগেই বলেছি, মারকসবাদ সমাজতন্ত্র এইসবের বাজারদর ইদানীং বিলক্ষণ বেশী। বলুন তো, "মারকসবাদী নই" বলে নিজেকে ঘোষণা করে, হালের ভারতবর্ষে এমন বুকের পাটা কার? যাঁরা মারকসবাদ বোঝেন তাঁরা তো বটেই, যাঁরা ও-বস্তু চোখেও দেখেননি, শুধু কানে শুনেছেন, তারস্বর মারকসবাদী তাঁরাও। বরং কে কম কে বেশী এই নিয়ে যত গলাবাজি, যত প্রতিযোগিতা, যত

তক্‌রার। অর্থাৎ ইনি যদি বিনয়বশত থামেন মুরগি-মাটনে, উনি যাবেন আরও কিছুদূর অবধি—গোমাংস ভক্ষণে!

অন্যে পরে কা কথা, সুভাষকে নিয়ে শোক বৃথা, আপনারা লক্ষ্য করেননি কি যে, সম্প্রতি গান্ধীকেও মারকসবাদে শুদ্ধি নিয়ে জলচল হতে হয়। গান্ধীবাদই প্রকৃত মারক্‌সবাদ, এই সেদিন এমন একটি অকাতর উক্তি করেছেন গান্ধীভক্ত বলে পরিচিত মুখ্য নায়কদের একজন। অতত্রব সর্বত্র যখন সমীকরণের পালা চলেছে, তখন বৃথা এ-ক্রন্দন।

এবং এ-কথাও তো বলা চলে না যে, এই প্রবণতা নিতান্তই অদ্যতন। ভাবের ঘরে চুরিটা ডাকাতিতে ঠেকছে বলেই না আঁতকে উঠছি। গান্ধীজীর না-হয় বড়ই দুর্দিন তাঁর এই শতবার্ষিকীর বছরে। একদিন তো তাঁরও সুদিন গেছে, ছিল জনচিত্তে অপ্রতিহত, অপ্রতিরোধ্য প্রভাব আর আলোড়ন। সেদিন সর্বাংশে তাঁর মতে বিশ্বাসী না হয়েও কি তাঁকে প্রণিপাত জানাননি স্বয়ং নেহেরু এমন-কী সুভাষও?

ইতিহাসের এক-এক পর্বে এক-একজন প্রধান হয়ে ওঠেন, কখনও-বা তাঁদের আদর্শকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-মূর্তিকে সার করি। কালের পর কালের প্রবাহে অসংখ্য নাম, বরণ আর বর্জনের চক্রাবর্ত। পরবর্তী সময় নিজের স্বার্থে নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করেছে পুরোবর্তী এক-একজনকে, আবার নিজের প্রয়োজনেই হয়ত কালক্রমে পুনরাবিষ্কার করেছে তাঁকে, ব্যবহার করেছে তাঁর নাম। যেমন সোভিয়েট রাশিয়াও মহাসমরকলে খুঁজে পেয়েছিল এমনই একজনকে—জার-আমলের সেনাপতি কুটুজফ। সেই রাশিয়াই আবার নির্মমচিত্তে বিস্মরণ-নির্বাসনে পাঠিয়েছে স্তালিনকে। ইতিহাস মানে কেবলই ক্রুশে-হনন আর পুনরুজ্জীবন। সর্বকালে সর্বদেশে সত্যই পূজিত, এমন স্মরণীয়দের সংখ্যা বেশী নয়।

কে জানে, কালক্রমে হয়ত পুনরুজ্জীবিত হবেন স্তালিনও।

রাশিয়ার নিজেরই প্রয়োজন। আমরা যেমন একদা পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম প্রতাপাদিত্যকে, শিবাজীকে, সিরাজদ্দৌলাকে। মনে নেই? সব সময় বাছবিচারও তো করিনি। আসল কথা গরজ বড় বালাই—গরজটা বলা বাহুল্য ওঁদের নয়, আমাদের। সেই গরজেরই রকমফেরে আজ দেখি মারকস, গান্ধী, সুভাষ সকলকেই স্থাপিত করা হচ্ছে পাশাপাশি, সমাসনে; পুণ্যনামগুলির মূল্যক্ষয় যতদিন না হয়, ততদিন সকলকে অতি অবশ্য অবশ্য মেলানো চাই। এ শুধু রাজনীতিতে ডবল স্ট্যান্ডারড নয়, ডবল সুদ বা সুবিধা উশুলের কৌশলও এইটাই।

“ভোলা বাবা
পার করেগা”

অনেকের বিষয়ে অনেক কথা অনেকবার তো বললাম। এবার ভাবছি, বলা-টলার কোনও মানে আছে নাকি! নিজের সম্পর্কেই তাই সোজাসুজি এই কথা দিয়ে শুরু করছি—বলব কী? আমার দেশকে আমি চিনি না। স্বদেশ আর সমকালকে বুঝতে পারি না, এ কথা স্বীকার করার চেয়ে কষ্ট আর লজ্জা নেই।

যে-ঘরে আমার বাস, তার সামনে দিয়ে অবিরল জনস্রোত বয়ে যায়। প্রায়শই যায় মিছিল। সমবেত কণ্ঠে সততই উচ্চারিত যে-ধ্বনি, তার অর্থ জানি: বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্। হোক্ না। কিন্তু মিছিল মিলিয়ে যেতেই ঢোলখোল বাজিয়ে আসে হরিসংকীর্তনের একটি দল। এরা কারা? এরাও অবশ্যই ভক্ত, মুক্তি চায় জাগতিক যন্ত্রণা থেকে। যেমন, আধ ঘণ্টা আগেকার মিছিলের মানুষদের দাবি: যাবতীয় অত্যাচার থেকে মুক্তি। আবার, বিশেষ করে এই চৈত্রমাস জুড়ে, দিনেরাত্রে দলে দলে বিভক্ত মানুষের কণ্ঠে “ভোলা বাবা পার করেগা, বোম্-বোম্ তারকনাথ”, এই উচ্চ-রোল শুনি। তাদের হাতে ত্রিশূলের ঝনৎকার, ঘড়ায় ভরা গঙ্গাজল—এরা তারকেশ্বরের পথে পদযাত্রী।

তারাও “মিলায়ে যায়।” মিলিয়ে যেতে যেতে—নিশ্চয়ই দেখার ভুল—দেখি, সবাই মিশে গেছে এক সঙ্গে, এই মহাভারতের জনতা। কোথাও গিয়ে সব এক, ময়দানের সমাবেশে, এবং অর্ধোদয় কিংবা চূড়ামণিযোগে গঙ্গাতীরে মুক্তিস্নানে। সংখ্যা উভয়ত্রই লক্ষ লক্ষ। একই আকুলতা যা বর্তমান তাকে অতিক্রমণের; একই চিত্র প্রশ্নহীন গ্রহণের এবং সমর্পণের। তাই একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটির চলে না। তাই রাজনীতি ঢুকে যায় সর্বজনীনে, আজ কেন, ঢুকেছে

অনেকদিনই। পার্বণে প্রসারিত চাঁদার খাতা থেকে অথবা কমিটির নাম পড়ে, আরাধ্য দেবদেবীর মর্ত্য আরাধকদের কুলগোত্র অনুমান করি! একদা চাঁদা যদি দিয়ে থাকি কংগ্রেসী দশভূজাকে, সি পি এম কালীকেই বা এড়িয়ে যাব কোন্ যুক্তিতে! সি-পি আই সরস্বতীরাও অবশ্যই অবতীর্ণ হবেন, হয়ে থাকবেন ইতিমধ্যেই। জানি না। এখন আরও ছোট দল-উপদলগুলির পক্ষ থেকে সর্বজনীন ইতু বা সুবচনীরা, "চাঁদা দিন, নইলে যেতে নাহি দিব" বলে কবে পথ রোধ করে দাঁড়াবেন, সেই অপেক্ষায় আছি। বলা আবশ্যক, এবার শিবচতুর্দশীর উপোসের চাঁদাও দিয়েছি।

*

চমৎকার একটি কুটিরশিল্প—চাঁদা; আর মাঝারি শিল্প বোধ হয় সর্বজনীন। উদ্ভাবনী মেধা নেই কে বলে। এবং সব সময়েই রাজনৈতিক উদ্যোগে নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে। অপর আর একটি কুটিরশিল্প, কানা ঘুষায় শোনা যায়—ডিস্‌টিলারি। তবে তাতে ঝুঁকি বিলক্ষণ বেশি, বিনিয়োগের পরিমাণও নিতান্ত কম নয়।

এই প্রসঙ্গে খেয়াল হল, আরেকটি কুটিরশিল্প নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য পণ্যে যাই হোক, ঘরে ঘরে বোমা বানানোর বহর যা বাড়ছিল —এবং রীতিমত সুস্থ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে—তাতে অচিরাৎ আমরা, এই উপকরণটিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতাম নির্ঘাৎ। আর, উৎপাদনের ওই হার বজায় রাখতে পারলে, বলা যায় কি? —১৯২২ সন নাগাদ রফতানি করাও হয়ত অসম্ভব হত না। (টন কয়েক পেটো বা পটকার বিনিময়ে আস্ত দু'একটা পরমাণু-বোমাও কেনা যায় কি না, আন্তর্জাতিক বাজার-বিশেষজ্ঞগণ সেটা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। উক্ত 'বারটার ডীল্'এর একটা বড় বাধা কিন্তু এই যে, পেটো টেটো পাবলিক সেকটরে উৎপন্ন

হয় না। বিনিময়যোগ্য "রিসোরসেস্"-এর আন্দাজ নেওয়া একটু কঠিন হবে।)

*

পাবলিক সেকটরে সবচেয়ে ফলাও কারবার কী, ইস্পাত? না। সার-কারখানা? হল না। এক বন্ধু সেদিন বলেছিলেন, আপনারাও একটু ভাবলেই বুঝতে পারতেন, সরকারী সেকটরে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায়—লটারি। বিবিধ রাষ্ট্রিক উদ্যোগে গুণগার দিয়ে দিয়ে আর লোকসান গুণে, এই একটি ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি রাজ্য সরকার অসামান্য সাফল্য দেখাচ্ছেন। জয় হোক নব-নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধির।

আরও একটি বিরাট "আনডারটেকিং"-এর কথা মনে পড়ছে, তবে সেটি বিধিবদ্ধ হয়েছে মাত্র কিছুকাল আগে। তার নাম "টপ্‌লিং।" যেন-তেন প্রকারেণ গণেশ ওলটানো, উল্টে আবার সিধে করার সৎ-চেষ্টা আর সদিচ্ছা, দিব্য একটা কারবার দেখা যাচ্ছে, এই কারবার নতুন একটা দিকের ইঙ্গিতও দিচ্ছে। কোথাও বিবেক কোথাও প্রগতি এই কারবারের একমাত্র পেইড্‌-আপ ক্যাপিটাল। তবে নতুন কারবার তো। তাতে আবার এই উপায়টা নকল করা সহজ, ফলে প্রথম প্রণেতারা "পেটেনট রাইট" রাখতে গিয়ে হিমসিম। তাই আখেরে ব্যাপারটা কত লাভের, কত লোকসানের, সেটা অন্তত বছর পাঁচেকের ব্যালান্স-শীট তৈরী না হলে বোঝা যাবে না। কমিশনের দালালদের ঘরে যতই আসুক, ততদিন আমরা ক্রেতারা টিকব তো? বিশেষ ভরসা করি না।

কেননা, ওই "আন্‌ডারটেকিং" শব্দটা কাছাকাছি আর একটা শব্দকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে—"আনডারটেকার।" কথাটার মানে যারা সৎকারের সুব্যবস্থা করে। অধুনাতন গোষ্ঠীগত রাজনীতি ক্রমশ কি সেই রূপ পরিগ্রহ করছে যাকে বলা যায়, "জাতীয় সৎকার সমিতি?"

*

অস্থির হয়ে তখন রাস্তায় নেমে যাই, যেখানে বহতা পানি; শুরুতেই বলেছি, অবিরল জনস্রোত যেখানে। যা হল তা-ও ভালো, যা হবে তা-ও ভালো, এমনই একটা নির্লিপ্ত প্রশান্তির ছাপ মুখে মুখে। নিত্য খবর পড়ি এত যে হানাহানির, অথচ কারও মুখে হিংস্রতার চিহ্নমাত্র দেখি না। বরং চোখে পড়ে নিরুদ্বেগ জীবনের প্রতি পরম আগ্রহ; দোকানে-সাজানো, ফুটপাথে-বিছানো পসরা, দরদস্তুর, বাছাই, কেনাকাটা; সিনেমা-ঘরে ভিড়। তখন আবিষ্কার করি, এই সমকালকে আমি চিনি না। হঠাৎ যদি উৎপাত হয়, ভাবি, এরাই কি দুদ্দাড় পালাবে, বেসাতি পড়ে থাকবে রাস্তায়, ঝপাঝপ ঝাঁপ বন্ধ হবে?

উৎপাত কেন, যেদিন বৃষ্টিপাত হয়, সেদিনও চারদিকে চেয়ে ভীষণ ভয় পাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে মানুষ, ট্রাম বন্ধ, বাস বিরল, ভয়ার্ত নর-নারী, আমি এবং আপনি, এই নগরীরই নাগরিক, ব্যাকুল ছুটোছুটি, মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে বামপারে দাঁড়ানো, সাহসীরা সিঁড়িতে ঝুলন্ত, সহিষ্ণুরা দু'ধারে নিরুপায়, ঢেউগুলি ভাঙাভাঙির দর্শক, ছুটতে গেলে বে-মেরামত রাস্তায় হোঁচট, নিরালোক চৌদিকে পরিব্যাপ্ত আতঙ্ক।

তখন সব মিলে যে কাহিনী ফুটে ওঠে, সেটা একটানা প্রতারণার। এই নাগরিকদের প্রত্যেকে প্রতারিত, একের পর এক জমানা এসেছে, গেছে, সকলেই এদের ঠকিয়েছে। চলাফেরার ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বস্তির ব্যবস্থা করেনি। পরিবহণের বিকল্প শুধু বড় বড় প্রকল্পের গালগল্প। পরিবহণ তো শুধু একটা নমুনা। একই ইতিহাস স্কুলে, হাসপাতালে, গৃহসংস্থানের গাফিলতিতে। এক ইতিহাস।

প্রতিবাদ কি আছে? চেয়ে দেখি, তা-ও তো নেই। নতুবা অন্য ইতিহাস রচিত হত। দেখি, সমস্ত ছবিটাই বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, মেনে নেওয়ার। এই সহজ সমর্পণের সমাজে প্রগতি, সমাজতন্ত্র,

বিপ্লব সব কিছুরই শোধিত রূপ সহজিয়া! নতুন রাস্তা বানানোর চেয়ে পুরনো রাস্তার নাম বদলানো অবশ্যই অনেক প্রগতির সূচক, কারণ কাজটা সোজা। কিন্তু আমরা তো বিশ্বাস করেছি। যেমন মেনে নিয়েছি যে, বিপ্লবের অর্থ শুধু গদি আর মন্ত্রিত্বের পরমার্থ। অবিচল ঐহিক বিশ্বাসেরই ওপিঠ হল অচলা পারত্রিক ভক্তি। সত্যিই তো, আমাদের আর কী গতি, "ভোলাবাবা" ছাড়া? একমাত্র তিনিই পারেন তরিয়ে দিতে; ভোলাবাবাই তাঁর ভোলা পুত্রদের "পার করে গা!"

দায়—সমাজের কাছে, সময়ের কাছে

ভাবছি "সোজাসুজি" আর না, এই স্বগত বিলাপগুলির নাম রাখব "অরণ্যে রোদন"। যে অরণ্যে দিবা-দ্বিপ্রহরে অন্ধকার নেমে আসছে।

বিষণ্ণ এবং বিপন্ন এই মুহূর্তে সেই কারণেই কথার চতুর কচকচি, ধুরন্ধর কলমবাজি বাঁজা ডাঙায় হাল চালানোর মতো ঠেকছে। "সোজাসুজি ?"—দূর, ওটা নিশানে লটকানো মিথ্যে একটা বড়াই ; স্পষ্ট বক্তব্যকে সাহসী রৌদ্রে ব্যক্ত করে দিতে পারছি কই !

ঘোলাটে আকাশটাকে দেখছি ঘরের ঘুলঘুলির ভিতর থেকে, ইঁদুর যেমন গর্তে বসে ছ্যাখে জগৎটাকে। অথবা পারলেই পালাচ্ছি। অশ্রাব্য আস্ফালন কানে এল তো অমনিই সভয়ে কানে-তুলো, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে বসছি যোগাসনে। পলায়ন, শুধু পলায়ন।

চোখ বন্ধ করে মনশ্চক্ষে এইমাত্র দেখলাম কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহ নিষ্প্রদীপ ; ধুপধাপ, দুমদাম, পরদা ছিন্নভিন্ন, মাথা নীচু করে দর্শকবৃন্দ —দিশেহারা সন্ত্রস্ত, বিমূঢ়—ফাঁদে-পড়া জন্তুর মত বেরোবার পথ খুঁজছে। নিজেকেও দেখতে পেলাম তাদের মধ্যে। কারা চড়াও হয়েছিল এবং কেন, জানি না। ওই ছবিতে কালিম্পং কি কলকাতা ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, এই রকম কোনও উদ্ধৃত উক্তি কি ছিল ? সদুত্তর পেলাম না। ছবিটি পত্রপাঠ গুটিয়ে নেওয়া হল, বৃষ্টি নামতেই আমরা শুকোতে-দেওয়া কাপড়-টাপড় যেমন তুলে ফেলি, তেমনই। আর, তার পর দিন, আহা, ঢেঁকুর তুললাম আশ্বাসে-পরিতোষে। কেন না "সিনেমায় সিনেমায়" অতঃপর পুলিস-পাহারা থাকবে—সরকারী মুখপাত্র উবাচ। পুলিস-পাহারা মানে তো "আর্মড্ পীস্" ? শান্তিরস্তু শান্তিঃ। কিন্তু মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এ-রাজ্যে কত পুলিস আছে ?

সুতরাং, আর কী, নিশ্চিন্ত হয়েছি; যদিও নাইট-শো নির্বিঘ্নে চলবে কিনা এখনও জানি না। আমি যে নাইট-শো-টোর খুব ভক্ত তাও না। তবে সামান্য নাগরিক বুদ্ধি দিয়ে বুঝি যে, নৈশ-প্রদর্শনী ইত্যাদি অব্যাহত থাকা মহানগরীতে নির্ভয় প্রাণপ্রবাহের প্রমাণ।

*

তার একদিন পরেই দেখলাম, গলিতে একটা মিছিল এল, যোগদানকারীরা সংখ্যায় কয়েক ডজন মাত্র। অমনিই পটাপট সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল। কথাটার কদর্থ করবেন না, আমার কটাক্ষ মিছিল সম্পর্কে নয়, অসমসাহসী এবং অনাগতবিধাতা যে-দোকানীরা চটপট পশ্চাদপসরণের প্রত্যুৎপন্ন নমুনা দেখালেন, তাঁদের প্রতি। তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি এই কারণে যে, প্রাচীন একটি ছড়ার মানে—যা ছেলেবেলা থেকে বারবার শুনেও বুঝতে পারিনি—তাঁরা জলের মতো বুঝিয়ে দিলেন।

ছড়াটার নাম "বর্গী এল দেশে।" সামন্তযুগের সায়ংকালে অশ্বারোহী যারা হঠাৎ-হঠাৎ হানা দিত, করত লুটপাট, সব ছারেখারে যেত, তারা সংখ্যায় কত? প্রথম দিকের আক্রমণগুলি না-হয় আকস্মিক, কিন্তু পরবর্তীগুলি? প্রতিরোধের সামান্য শক্তিও কি ছিল না ম্রিয়মাণ গ্রামগুলির? কিংবা দক্ষিণবঙ্গ যখন রাত্রিদিন হারমাদের ডরে কাঁপত—পর্তুগীজ বোম্বেটেরাই বা এক-একবারে আসত কত? লক্ষ লক্ষ নিশ্চয়ই নয়! এই জিজ্ঞাসা আমাকে দংশন করত, এখন টের পাচ্ছি, আত্মসমর্পণ এবং আত্মবিলাপ আমাদের মজ্জাগত। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, সেদিনের সেই মিছিল, যতদূর জানি, সশস্ত্র ছিল না।)

বর্গীদের প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ইতিহাসের আরও পিছনের দিকে চলে যাচ্ছি। মূর্খ কিনা! তাই ভাবছি, কে জানে—পণ্ডিতেরা যাই বলুন—সতেরো ঘোড়সওয়ারের বঙ্গ-বিজয়ের ব্যাপারটা হয়ত-বা

একেবারে বানানো না! আত্মাকে হত্যা করে আত্মরক্ষা আমাদের শিষ্ট ইতিহাসের শিক্ষা। লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকার।

*

কিন্তু অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে বরাবর বসে যদি থাকা যেত তো চমৎকার হত—মুশকিল এই, বাঁচতে হয় বর্তমানে, তাকাতে হয় সামনে। অন্যায় যে করে তাকে নিয়ে তিনি কবে সমুচিতভাবে পড়বেন, পড়বেন কিনা আদৌ, সে তাঁর ইচ্ছে। আপাতত দেখছি তাঁর ঘৃণা তৃণসম দহন করছে অন্যায় যে সহে, তাকে। সেই দহনের বড় জ্বালা।

নইলে অনেকদিন অবধি তো কোনও গোল ছিল না, যতদিন বাঁচার ভড়ং বজায় রাখা চলছিল গায়ে আঁচটুকু না লাগিয়ে। যতদিন আমরা বিলেত-ফেরতা ক' ভাই দেশে বিপ্লব-আদি রটাতাম—কফি-হৌসে বসে অথবা পানশালার দিব্য আবেশে। আমরা যারা বুদ্ধির অভিমানী, কেউ বা অনর্জিত স্বাচ্ছল্যের অধিকারী; টাট্‌কা-টাট্‌কা পেপারব্যাক পাশে রেখে তুড়ি মেরে বেয়ারাকে বোলাচ্ছি, পুঁজিবাদীর শেয়ারের ইয়ার হয়েও কেউ-বা পুঁজিবাদের করছি শ্রাদ্ধ, বস্তুবাদ নিয়ে দ্বন্দ্বমূলক তর্কে মেতেছি। বৈপ্লবিক বাতচিতে আর অসুবিধা কী, বিশেষত বিপ্লব সত্যিসত্যিই তো কিছু আসছিল না! এসটাব্‌লিশ্‌মেন্ট নামক কল্পতরুটির কাছ থেকে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা আদায় করে নিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলেছি, তুখোড় ইংরিজীতে, "নাথিং কুড্‌ বি ওয়ার্স!" বলেছি আমরা, যারা ফিকে কিংবা গোলাপী কিংবা গাঢ় রঙের প্রগতির জোব্বাধারী। যারা সংবিধানের নামে কিছুমাত্র জমা না-রেখে তার সুদটুকু ভোগ করতে চেয়েছি।

তখন অবশ্যই অন্তরালে অপাঙ্গে কেউ হেসেছিলেন। কেননা, যে-ঘাটে বসে জলে শুধু পা নাচাচ্ছিলাম, সেই ঘাটে ঢেউ আছড়ে পড়ল, ছাপিয়ে গেল কোমর, বুক। শৌখীন মজদুরিতে শেষ সিদ্ধি নেই—বন্যা সর্বপ্লাবী। সিকি-হাফ-তিনপোয়া বিপ্লবীরা যতকাল

ছিলাম এককাটা ততকাল আর ভাবনা কী, বাকী সব্বাই তো দালাল। কিন্তু—

হাফ-বিপ্লবীরা যখন সিকি বিপ্লবীদের টিটকিরি দিতে শুরু করে? তিন-পোয়ারা কান মলতে চায় হাফদের, আর ষোলর উপরে যারা আঠারো আনা তারা আসে সকলের ঘাড় মটকাতে? তখন কেতাবে পড়া থিয়োরির সঙ্গে প্র্যাকটিস মেলে না, অন্ধকারের ছায়াভয়চকিত মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় আঘাতে আর সন্ত্রাসে। যে-সততাকে একদিন ছেঁড়া কাপড়ের মতো ফেলেছিলাম ছুঁড়ে, সেই সততাই আরও একবার বলিয়ে নেয় "নাথিং ক্যান বি ওয়ার্স—এর চেয়ে সে-ও অন্তত কোনো কোনো দিক থেকে ছিল ভাল।"

তখনও একজন অন্তরালে আরও একবার হাসেন।

অবশ্য এখনও বলা হয় নিরাপদ নিভৃতিতে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে, সঙ্গোপনে। প্রকাশ্যে বলার উপায় নেই।

ইদানীং তাই ভয় আর ভড়ং দু'টোই বজায় রাখছি, যতদিন চলে। ইতিমধ্যে একদিন কি পত্রিকার স্টল লুট হল? বুকে হাত দিয়ে দেখেছি, আমি কিন্তু বেঁচে আছি। এ-দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনটি বস্তুত বন্ধ হয়ে গেছে? আমার কী। তেমনই, চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহে-গৃহে যদি অন্ধকার নেমে আসে, কলকাতায় কোনও বড় রকমের খেলা আর সম্ভব হবে না এ-কথা যদি নিশ্চিতও জানি, ছিনতাই, ট্রামে বাসে ছুরিকাঘাত যদি বেপরোয়া চলে, তখনও থাকব অবিচলিত।

আর—আর তাতেও যদি না কুলোয়, তবে মাঝে মাঝে মিষ্টি মিষ্টি প্রতিবাদী বিবৃতিতে সই দেব, আমরা, সর্বশ্রী মহোদয়েরা, মনে মনে এই আশায় যে, ওটা আমাদের এক ধরনের "প্রোটেকশন মানি।" একরোখা বৈপ্লবিক বাঘটার পিঠে যদি ঠাঁই হল না, তবে তার লেজ ধরে প্রাণপণে ঝুলব। কিন্তু নামব না।

উপায় আরও তো কত আছে। এক, প্রাগতিক লাইনে প্রতিযোগিতা। নতুবা বসিয়া বিরলে রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রবণ এবং সেই

অবক্ষয়ী পাপ খণ্ডাতে থেকে থেকে জ্বালাময়ী কাব্য-উৎসারণ (শুনছি তা-ও নাকি "থামাও" বলে হুমকি আসছে) ; মরমী গল্প-টল্প রচনা অথবা চোখা কলম শানিয়ে শানিয়ে ফীচার—আমি যেমন লিখলাম। মস্তানদের মুখে-মুখে রুখে দাঁড়ানোর চেয়ে তাঁদের নিয়ে লেখা-টেখা কি ঢের নিরাপদ নয় ?

*

তবু তাতেই কি পরিত্রাণ আছে ? নেই। মনের আকাশ এক-এক দিন বায়ুশূন্য বোধ হবে, পায়ের তলায় মাটি কেঁপে যাবে একদিন না একদিন যত ছলনা, যত কপটতা, অন্যকে ঠকানো, ঠকানো নিজেকেও, সব বিস্ফোরিত হতে থাকবে। এখনই নিশ্চয় হচ্ছে, আমার, আপনার, এমনই আরও অনেকের মনের মধ্যে। তখন বোঝা যায় যে, শুধু সওয়া, শুধু সায় দেওয়া কাজের কথা নয়, একটা দায়ও আছেঃ সমাজের কাছে, সময়ের কাছে, আপন সততার কাছে। সে-দায় ভাঙার নয়, গড়ার। সাহসের, সংহতির, প্রতিরোধের। সেই সাহস আবিষ্কার করবে যে, প্রতিটি অন্যায়ের মধ্যেও ভীরুতার বীজ থাকে।

আত্মতুষ্ট বালুস্তূপে অমায়িক মুখ গুঁজে আপাত-নিরাপত্তা অন্বেষণ একটা পাপ, সেই পাপ আমাদের প্রত্যেকের। জ্ঞানপাপীরা যেন পাপী বলে অন্যকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ না করি। তথাকথিত সমাজ-বিরোধীদের সম্পর্কে আজ তাই বিশেষ বাক্যব্যয় করিনি, ঘা দিয়ে নাড়াতে চেয়েছি শান্ত-শিষ্ট আধমরা সামাজিক সত্তাকে, নিরুপদ্রব নতি আর পোষমানা আপোষকেঃ আজকের চাঁদমারি আমাদের নিজেদেরই বুক লক্ষ্য করে।

আমাদের কোনও
একুশে ফেব্রুয়ারি নেই

অসফল এক লেখকের—তার নাম লিখে আর কাজ কী—নানা রাত্রির স্বপ্নে একটি ছবিই ফিরে ফিরে আসে: একটা রেল গাড়ি ছাড়ছে, সে দৌড়চ্ছে ধরবে বলে, গাড়িটা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তার জন্মস্থলে, দৌড়চ্ছে সে প্রাণপণে, কিন্তু হল না, হল না, ফসকে গেল, ছেড়ে দিল গাড়িটা। তাকে নিয়ে গেল না।

এই তার স্বপ্ন। মাঝে মাঝে স্মৃতিও ভাসে, জলস্রোতে আকস্মিক এক-এক ঝাঁক উজ্জ্বল মাছের মতো। প্রত্যাবৃত্ত হয় প্রোনা কোনও নদী। একবার সে লিখেওছিল: "সেকাল, সেকাল, আমার সেই সকাল। যেখানে উত্তরে সেই নদীটি ছিল।······অনেক রাতে ইস্টিমারের ভাঙা মোটা জলদগম্ভীর সিটি, গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর। নিশির ডাকে মশারির চাল পাল হয়ে দুলত। অনেক বালি ভেঙে ভোরে সেই নদীর ধারে পৌঁছনো যেত। যেতে যেতে অনেক তরমুজ ভাঙা, তাদের টকটকে হৃদয় চেখে চেখে দেখা—মনে পড়ে।"

জীবনের শেষ ক'টা দিন যদি রাজবাড়িতে কাটাতে পারে, যদি—যদি······এই রকম একটা অভিলাষ তার একান্ত এক দিনান্তলিপিতে লেখাও আছে।

আশ্চর্য, সফল এবং সার্থকনামা কোনও লেখিকা ঢাকা থেকে সদ্য-আগত দুটি মুসলিম তরুণীর কাছে, প্রায় প্রথম সম্ভাষণেই, অবিকল ওই একই বাসনাকে বাজিয়ে দিলেন। —"যখন ওখানে থাকতাম তখন এতটা বুঝিনি, বরং কলকাতায় আসতেই বেশি ব্যস্ত তখন। এখন মনে হয়, ঢাকাতেই মরতে যদি পারি"—এই রকম কয়েকটা কথা, অবশ্যই ভাবাকুল তবু স্বতঃ এবং অনেকাংশে সত্য। আমরাও এক অর্থে ছিন্নমূল, আমরা, যারা দেশ বিভাগের দীর্ঘকাল আগে থেকে কলকাতায় বসবাসী।

প্রকৃতি-প্রতিমার যারা শতনরী হার, সেই সব নদী, নদীর পর নদী, আজও তারা প্রবাহিত, আমাদের স্মরণ-চারণেই শুধু। আমাদের বক্ষের শিরাগুলির নাম সেই নদী। এই বঙ্গে তার তুল্য কিছু দেখিনি, খানিকটা বিকল্প মেলে খালি দক্ষিণে—ক্যানিং পেরিয়ে উত্তাল মাতলায়; গোসাবার, বাসন্তীতে; অথবা সপ্তমুখী, ঠাকুরান আর রায়মঙ্গলের বাঁকে বাঁকে।

তবু "বাংলা নামে দেশ" বলতে রামেন্দ্রসুন্দরের ব্রতকথায় যা পড়েছি, কিংবা 'সুজলা সুফলা' বলতেই মনে যে-ছবি আসে, তার বৃহত্তর ভাগ আমাদের ছেড়ে-আসা গ্রাম-গঞ্জেই যে ছড়িয়ে আছে সেটা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করি। পদ্মা যে রবীন্দ্রনাথেরও যৌবনের সহচরী।

পূর্ববঙ্গই যে মূলত বঙ্গ, তার প্রমাণ কত। প্রথমত 'বঙ্গজ' শব্দটি; ইঙ্গিত দিচ্ছে যে একদা অন্যেরা নৈকষ্য বঙ্গীয় ছিলেন না। কিংবা নিজেদের তা ভাবতেন না। ঠাউরে রেখেছিলেন যে, তাঁরা বহিরাগত। ঠাট্টায় 'বাঙাল' কথাটাও ওই একই সাক্ষ্য দিচ্ছে: বাঁকুড়া থেকে চট্টগ্রাম, তরাই থেকে সুন্দরবন একদা ভৌগোলিকভাবে এক হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু সমগ্র অঞ্চলটিকে 'বঙ্গ' এই নামটি ধার দিয়েছিল পূর্ববঙ্গ। যেমন 'ফারস্' নামে একটি জেলার নামে একটা দেশের নামই হয়ে গিয়েছিল পারস্য, যার ভাষার নাম ফারসী।

আজ আমরা ওই বঙ্গে নেই, চলে এসেছি। আর হয়ত ফিরে যাব না। চলে আসছেন আরও অনেকে, অজস্র মানুষ, দলে দলে— আতঙ্কে অনিশ্চয়তায়, অতিষ্ঠ হয়ে, হয়ত উৎপীড়নেও। সেটা এই উপমহাদেশের এক ঘোর লজ্জাকর রাজনৈতিক দিক; রাষ্ট্রিক সেই ব্যর্থতাকে আজকের আলোচনায় টানব না। আজকের সুরটা বেদনা—সাংস্কৃতিক সংবেদনা; যা বিচ্ছেদের ভগ্নশেষ 'পরেও সৌধসম উন্নত, সেতুসম সংযোজক হয়ে আছে।

*　　*　　*

এখানে অকপটে কবুল করা ভালো, রাষ্ট্রিক বিভেদের মধ্যে আত্মিক অভেদকে বাঁচিয়ে রাখার কৃতিত্ব পূর্ববঙ্গের যতটা, আমাদের তত নয়। আমরা ওড়িয়া, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়ে যতটা উদাসী পূর্ববঙ্গের বিষয়েও প্রায় ততটাই, যদিও এক্ষেত্রে ভাষাগত ব্যবধানের অজুহাতটা খাটে না। যোগাযোগের প্রত্যক্ষ উপায় বস্তুত ছিন্ন, এটা বরং বেশি বিশ্বাসযোগ্য একটা কারণ। কিন্তু এই বাধা ওঁদের কাছে তো দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে ওঠেনি। কপিরাইট লঙ্ঘন, চোরাচালান আইনের দিক থেকে নিশ্চয় গর্হিত, কিন্তু শুদ্ধ সেইজন্যই আমাদের জানবার আকুলতা মিথ্যা হয়ে যায় না। মিথ্যা হয় না রবীন্দ্রনাথের প্রতি ওঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি।

অথচ আমাদের ঔৎসুক্য যে নেই তা-ও তো নয়। পূর্ববঙ্গের হাঙ্গামার বিবরণ সংগ্রহেই সেই উৎসাহ ব্যয়িত হয়ে যায় বেশি। আমাদের বেতার অবশ্য কিছুকাল সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় কাজে যোগ্য ভূমিকা নিয়েছে, কিন্তু লিখিত, মুদ্রিত বা স্থায়ী প্রমাণ তো বেশি দেখি না। দু'একটি প্রকাশিত সংকলনের ছিটে-ফোঁটা— এ-পর্যন্ত এইমাত্র।

কালে-ভদ্রে পূর্ব-বাংলার কিছু কিছু লেখা হাতে আসে। কোন-কোনও কবির কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠি—এত তাজা, এত তরুণ, এত নতুন? যেমন 'কালের কলস'; পরমাশ্চর্য এক কাব্য গ্রন্থ। 'অথবা' নামে একটি পত্রিকায় বাঙালী মুসলমান মেয়েদের লেখা গল্প পড়ে সহজ, অকুণ্ঠ সাহসী উন্মোচনের নিদর্শন দেখে বিস্মিত হয়ে যাই।

একেবারে হালে হাতে পড়ল আর তিনটি বই: জাহির রায়হানের দু'টি উপন্যাস, আর মূর্তজা বশীরের একটি গল্পের বই। গল্পগুলি টাট্‌কা প্রকরণে পরীক্ষামূলক, অস্থির, শিল্পবিচারে সিদ্ধ। কই, এ-সবের খবর এতদিন পাইনি তো। উপন্যাস দু'টি বাঙালীয়ানার ভাবে ভরপুর—একটিতে একুশে ফেব্রুয়ারির উন্মাদনা ওতপ্রোত। একটু

অতৃপ্তি তবু থেকেই গেল : গত বিশ-বাইশ বছরে ওদেশে নিশ্চয়ই নূতন এক মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ঘটেছে, তার ছাপ এই লেখাগুলোয় ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই উন্মেষ, সেই রূপান্তর নিয়ে কোনও 'সাগা', কোনও বৃহৎ-কথা কি লিখিত হয়নি? (আঠারো শতকের শেষভাগে আর উনিশ জুড়ে পশ্চিমবঙ্গেও সামাজিক রূপান্তর ঘটছিল ; কথা-সাহিত্যে তার সামগ্রিক ছাপ সামান্যই, যদিও উত্তম কিছু আলেখ্য আছে তার অবক্ষয়ের পর্যায় নিয়ে।)

* * *

তথাপি যা পড়লাম, যা পেলাম, তাতেই আলোড়িত হয়েছি। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ওখানকার মুসলিম সমাজে ভাবে-ভাবনায় ইতিমধ্যে তোলপাড় পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেশ বিভাগ রাষ্ট্রিক বা বৈষয়িক দিক থেকে তাঁদের পক্ষে শুভাশুভ যাই হোক, আশীর্বাদ এনেছে সাংস্কৃতিক দিক থেকে। তাঁদের সর্বাংশে বাঙালী করেছে। আত্মবোধ দিয়েছে, সেই সঙ্গে শক্তি। এই শক্তিকে আমরা আগে বুঝিনি বা সম্মান দিইনি। দুই বাংলা যখন এক, তখন ওঁরা "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী" গীতাংশ মানতে চান না বলে আমরা ভ্রান্ত জাতিবোধ থেকে আহত হয়েছি। আবার ওঁরা, কে জানে, কোন্ সঙ্কীর্ণ প্ররোচনায় বা প্রমাদে একদিন 'শ্রী' আর 'পদ্মে'র মতো দু'টি সুন্দর প্রতীককেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আজ সেই অতীত মুছে গেছে। আজ ওঁদের নানা লেখায়, রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে প্রাণঢালা ভালবাসায় অখণ্ড সাংস্কৃতিক চেতনার ঘোষণা শুনতে পাই। কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি, রাষ্ট্রিক বিচ্ছেদ কাছে থেকে যতটা দূর রচনা করেছে, ওঁরা তার চেয়ে দূরে যাননি। অথচ ইচ্ছে হলে যেতে তো পারতেন। এখনও এই অনুগাঙ্গেয় চলতি ভাষা পূর্ববঙ্গেরও স্ট্যানডার্ড বাংলা—নিত্য তার প্রমাণ পাই ঢাকা বেতারে আর লিখিত সাহিত্যে। তার চেয়েও বড় কথা বঙ্গসংস্কৃতি

ও বাংলা ভাষার জন্যে ওঁরা যা করেছেন, যত দিয়েছেন—আমরা তা করিনি, ততটা দিইনি। আমাদের কোনও একুশে ফেব্রুয়ারি নেই—আমাদের, এ-পারের বাঙালীদের, সখেদে একথা স্বীকার করি আর হিন্দীয়ানাইজেশনে ক্রমশ কোণঠাসা, সভয়ে ভাবি : ভাবী কোনও বৈদেশিক এনসাইক্লোপীডিয়ায় দেখব না তো যে, বাংলা ভাষার পরিচয় লেখা আছে এইভাবে : "দি ল্যাংগোয়েজ অব ইস্ট পাকিস্তান" : তারপর লেজুড় হিসাবে 'অলসো স্পোকেন বাই সাম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল !"

সে, তারা, তার মতো
আরও অনেকে

সে আর তার মতো আরও অনেকে। এবার তাদের কথা ; যারা সহৃদয় তথা "সংবেদনশীল", অন্তত নিজেদের সেইমত জানে। অপিচ তারা রুচিবান এবং সংস্কৃতি অভিমানীও। কম করে আট দশটি রবীন্দ্রসংগীত তাদের রোজকার রেশন, তারা প্রায় রুটিন করে শোনে।

শোনে, মানে শুনত। ইদানীং কিছুকাল আর শুনছে না, শুনতে পারছে না। কষ্ট হচ্ছে। ওই গানের কথা আর সুর বাইরের সব কিছু ঘট-ঘটাং ঘটনার আওয়াজের পাশে বেমানান ঠেকছে। মিলছে না, মেলানো যাচ্ছে না। তারা এখন কী করবে, সে আর তার মতো আরও অনেকে ?

রাজনীতির হাটে তারা সওদায় বেরোতে পারে না। কারণ, পোস্তার কাটরার বস্তাবন্দী পেঁয়াজ ইত্যাদি যেমন, ওই হাটেও তেমনই বেচা-কেনা হয় মানুষের প্রাণের, আত্মার, আনুগত্যের। তারা অগত্যা অতীতের শুকনো খড়ে মুখ গুঁজে জাবর কাটছে। মহাযুদ্ধ, নিষ্প্রদীপ, মহামারী, দাঙ্গা—একটানা টানেল, তার ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে তারা বেরিয়ে এসেছে। সে-চেহারা টান-টান দাঁড়ানো সৈনিকের নয়—নিপাট ভীরুর।

নিজেদের কাপৌরুষ তাদের নিজেদের কাছেই বহুকাল বিদিত। ইদানীং অন্য একটি সংশয় দংশন করছে : যথোচিত মানুষ তো—সে, তারা এবং তার মতো আরও অনেকে ?

অভিধান খুলে তারা "মনুষ্যত্ব" কথাটার অর্থ ছাখে, নিশ্চয় করে বুঝতে পারে না। আর বাংলা ব্যাকরণে ? কাছে-পিঠের ব্যাকরণ বইটি তো মনুষ্যত্ব "গুণবাচক বিশেষ্য" বলেই চুপ করে গেছে। কোন্ কোন্ গুণ, তা জানা যাচ্ছে না। দয়া-মায়া-স্নেহ, শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রীতি ;

শৌর্য-ঔদার্য—এই সমুদয় কি ? হলে, নিজ-নিজ চরিত্র বিষয়ে তাদের অস্বস্তি সমূহ।

*

মন্বন্তরের গোড়ার দিকে, তখন সে সবে সবুজ, রাস্তায় অসহায়ের হাহাকার শুনে কেঁপে উঠত; বাড়ির দরজায় প্রথম মৃতদেহটি দেখে চমকে ওঠে। তারপর? ও-সব গা-সওয়া হয়ে যেতে থাকল, যত্রতত্র কত শব—দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া অভ্যস্ত হয়ে গেল। অতঃপর তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া, এমন-কী ডিঙোনোও—ক্রমে ক্রমে সব রপ্ত।

অমানবিকতায় আর একটু প্রোমোশন: দাঙ্গার সময়ে ঘরের কপাট এঁটে তাস পেটা। আর গ্র্যাজুয়েশন কবে? সাংবাদিক বৃত্তির সূত্রপাতে, দুর্ঘটনা, অপঘাত, যুদ্ধ, প্লাবন, প্রভৃতিকে যখন বলতে শিখল "গুড্ কপি, খাসা খবর, কালকের কাগজটা ব্রাইট হবে", তখন। গ্র্যাজুয়েট বনে গেছে সেই থেকে। এখন অবশ্য এ-ব্যাপারে ডক্টর কি ডীন-টীনই বলা যায় তাকে। চৌদিকের চিৎকার কি অত্যাচার কোনও প্রকার বিস্ফোরণ ঘটায় না মনে, কোনও আলোড়ন না, একটি যান্ত্রিক সাড়াই জাগে শুধু: খবরটাকে কী-ছাঁদে বাঁধা হলে চমৎকার দেখাবে।

নির্মম-মর্মর সিঁড়িগুলো সে দিব্যি টপাটপ পার। তবে স্নায়ু যেদিন যৎপরোনাস্তি জর্জরিত, সেদিন অবশ্য পানশালাই পরমা গতি, সর্ব গ্লানি প্রক্ষালন। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতে মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে বিবেকের সঙ্গে আপস, টেকনিক হিসাবে ওটাও বেশ নূতন।

বাড়ির উৎসুক ঝুল বারান্দা থেকে অতএব সে বলবান ষণ্ডার হাতে নিরীহের নিগ্রহ ঝুঁকে পড়ে ছাখে। অনায়াসে তৈরী হয়ে যায় এক আমোদ-পাওয়া অর্ধবৃত্ত, যেখানে সে এবং তৎসম অনেকে। বিনি-দর্শনীর প্রদর্শনী যে। তবে হাততালি কেউ দেয় না, বিবেকের ওই ডুমুর-পাতাটি দিয়ে লজ্জা ঢেকে রাখে।

বাসে-ট্রামে মস্তানের ছুরি ঝিলিক দিল তো তারা সবাই মিলে সুড় সুড় করে নেমে গেল। নিরুপদ্রব অসহযোগের নীতিতে তারা মাছির মতো নিষ্ঠ। কোথাও পৈশাচিক হত্যা ঘটেছে—মনোযোগ দিয়ে সেই খবরটি পড়ে কাগজটা মুড়ে রাখল।

*

মৃত্যুতে কি হত্যায় বিহ্বল হওয়া—এই স্বভাব কি মানবজাতির শৈশবে ছিল? মনে তো হয় না। সেই কালে, ধরণী তখন এখনকার চেয়ে তরুণী, কিন্তু তার হৃদয়ে করুণাও কম ছিল। তখনও স্থিতি-স্থিরতা আসেনি, তাই বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, হিমানী সম্প্রপাত ছিল নিত্য। যেহেতু মানুষ তখনও অসহায় বন্য পশুদের হিংসার সে হত সহজ শিকার। আর যেহেতু দানা বাঁধেনি সমাজ, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক ও পৌনঃপুনিক, জান্তব জিগীষায় মানুষ পারস্পরিক উৎসাদনে মেতে উঠত। মৃত্যুর মহোৎসব তার প্রাণে কোন্ অভিঘাত জাগাত? ভয়ার্ত সে হত নিশ্চয়ই, কিন্তু যতটা ভয়ার্ত সম্ভবত ততটা শোকার্ত নয়।

কিন্তু ক্রমশ স্থির হতে থাকল প্রকৃতি, পৃথিবী, আর সবার উপরে মানুষ যত সত্য হয়ে উঠল, ততই জটিলতাও তার বাড়ল। কঠোরের সঙ্গে মিলল কোমলতা, স্থূলের সঙ্গে গোচর-অগোচর বহু সূক্ষ্মতা। মানুষের আধখানা ছিল জৈব, আধখানা কি তারও বেশি, আর সেই ভাগটা বস্তুত জন্তুপ্রতিম, কতকগুলি প্রয়োজন আর অভ্যাসের সমষ্টি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জাত হতে থাকল অন্য গুণাবলী, আমরা তাকেই কি মনুষ্যত্ব বলি? বহুর অপঘাতের এক দিন নির্বাক, অক্ষম অবিচলিত দর্শক ছিল যে, সে একের অভাবও বোধ করতে শিখল, একটি প্রিয়জনের বিয়োগের শূন্যতাকে নাম দিল শোক, একটিমাত্র মানুষের চোখের আড়াল হওয়ায় অনুভব করল বিরহ। পরবর্তীকালের মানুষ যতটা শক্তিমান, ততটাই কথায় কথায় আর্ত।

*

কিন্তু সেই আদি যুগের কাঠিন্য আর ঔদাসীন্য আবার কি ফিরে আসছে? নিজেদের নির্মমতায় শঙ্কিত হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে তারা আজ বলাবলি করছে—সে আর তার মতো আরও অনেকে। নতুবা আমরা মর্মান্তিক ক্রন্দনেও বধির থাকছি কী করে। স্থিরই বা আছি কী করে, যে-যার নিরাপদ নীড়ে বা কোটরে, চতুর্দিকে যখন ধ্বংস আর ধস্, সততার আর সর্বৈব মূল্যের, সর্বত্র যখন ভূমিকম্প? যত আবেগ ছিল সব চৈত্রের দীঘির মত শুকিয়ে গেল, আবার আদি স্বভাবে ফিরে যাচ্ছি যেন, আবার কি হব অসাড় পাথর?

এই জিজ্ঞাসা। তবু ভরসা আর বিশ্বাস পাখির মতো উড়ে গিয়ে ঠোঁটে একটি উত্তরও নিয়ে আসছে। ফিরে যদি গিয়ে থাকি, তবে হয়ত একদিন বেরিয়েও আসতে পারব। কেন না গতি তো থাকবেই, মনের গতি, সেই গতি যদি পিছোনো আর এগোনো হয় তবুও। অবশ্যই প্রত্যাবৃত্ত হব। ফিরে পাব হারানো মমতা, মানবিক বোধ, সেই সঙ্গে সাহস। কে জানে, একদিন হয়ত দেখা যাবে, আক্রান্ত ট্রাম থেকে নতমাথা তারা সুড় সুড় করে নেমে পড়ছে না। রুখে দাঁড়াচ্ছে সে, তারা আর তার মতো আরও অনেকে। দুর্জয় নির্ভয়তার পঞ্জরাস্থি দিয়ে তৈরী হয়েছে বলীয়ান, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ। আর, কী আশ্চর্য, সেই সুস্থ দিনে, মুক্ত মনে বেজে উঠছে মরমী-মায়াবী সুর, রবীন্দ্র সঙ্গীত নতুন করে শোনা যাচ্ছে।

রাজনীতি এখনকার মতো তোলা থাক। রাজনীতি তো আছেই মশাই, রয়েই গেল। আমরা থাকব বঙ্গে তো কপাল রবে সঙ্গে। এবার বরং খাজনাটা চুকিয়ে দিই, রবীন্দ্রবাবুর খাজনা। কারণ,

যখন গিয়াছি, তখন বৈশাখের লাশ জ্যৈষ্ঠ এসে জ্বালিয়ে দিয়েছে কবে, ইংরেজী হিসেবে মে-মাসও যায়-যায়, খাজনা দিতে এখনও দেরি করলে কর্তব্যবোধ নীলামে বিকিয়ে যাবে।

রবীন্দ্রবাবু জমিদার। জমিদারি ছিল পতিসর, শিলাইদহ ইত্যাদি জায়গায়। আমরা আর-এক জমিদারবাবুকে জানি, সেই ভূস্বামী যাঁর "ভূমির অন্ত নাই।" তবে সব প্রজা অনুগত হয় না। অনেক অবোধ প্রজা আছে যারা কার তালুকে বাস করে তা জানেও না। একদল তো আবার বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে বসে আছে, বিশেষ করে যারা কমবয়সী। তারা কসম খেয়ে ঠিক করেছে, 'খাজনা-টাজনা আর দিচ্ছিনে।' (সাহিত্যের নকশালপন্থী আর কী—বিদ্রোহের আওয়াজ যত, জোর তত নয়। জোর কম বলেই আওয়াজ বেশি তুলতে হয়।) এবার তাকান তাদের দিকে, যারা দাঁড়িয়ে থাকে কাতারে কাতারে; নাটমন্দিরে গানের পালা দিয়েছে শুনেই গদ্‌গদ পেন্নাম ঠুকে, দেউড়িতেই সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি যায়; জমিদারবাবুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় এদের বেশি নয়। এ-ছাড়া জো-হুজুর মোসাহেব আর গোমস্তাদের যা রকম-সকম, দস্তুরমত ঘেন্না হয়।

আমি কোন্ দলে পড়ি? নিজেকে জিজ্ঞাসা করে করে হদ্দ হয়ে গেছি, তবু কোন্ কেলাসে পড়ি, বুঝতে পারিনি। তবে বহুকাল থেকে সার কথা বুঝে বুঁদ হয়ে আছি, আমি তাঁর প্রজাই। বয়স হয়ে গেছে, এ-বয়সে এখানকার পাট তুলে অন্য কোথাও যে বসবাস করব, সে ভরসা পাইনে। অন্য কোথাও শিকড় পাব না, মাঝখান থেকে একেবারে উদ্বাস্তু হয়ে যাব।

আবার সারাক্ষণ "আমি প্রজা", "আমি প্রজা" বলে বুক ফুলিয়ে বেড়াবও না। ওটা আত্মসম্মানে বাধে, "দালাল", এই গাল খাবার ভয়ও থাকে। সাহেবরাও তো বলে দিয়েছেন, প্রকাশ্যে নোংরা কাপড় কাচতে নেই। পবিত্র পট্টবস্ত্রখানিই কি সবার সামনে ধোয়া চলে? যখন দরকার গায়ে জড়াব, নতুবা সন্তর্পণে তোরঙে তুলে রাখব।

তাঁর হয়ে সবার সঙ্গে কোমর বেঁধে কোঁদল করতে যাব না বটে, তবে মনে মনে বোঝাপড়া করব।

*

সেদিন দু'টি তরুণ লেখকের সঙ্গে এই নিয়ে খানিক কথাকাটা-কাটির খেলা চালালাম।

একজন বলছিল, তাঁর প্রতাপ যতই থাক, প্রভাব আর অনুভব করিনে।

বললুম, প্রভাব কি কোন খারাপ অসুখ, না পারদ নামক ধাতু যে গায়ে ফুটে বেরুবে। ওটা সহজ হয়ে মিশে থাকে, নিশ্বাসের মত—দেখতে পাইনে। অথবা—আমাদের দৃষ্টি দিয়ে রূপ নিত্যই দেখি, কিন্তু চোখ দু'টিকে কেউ কি নিরখি? আরও গভীরে যাও, অস্থিতে, রক্তে আর মজ্জায়; সব অপ্রত্যক্ষ, অস্তিত্বের সঙ্গে ওতঃ এবং প্রোত। তবু ভিতরে ভিতরে কোন দিন যদি বিদারণ ঘটে, সত্তা চৌচির হয়, সেদিন সব স্বচ্ছ দেখতে পাই। প্রভাব কেন সেদিন তাঁর আবির্ভাবও অনুভব করি।

একজন: আমি করি না। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের তফাত বাহাত্তর বছরের।

—ওটাও অতিরঞ্জিত হিসেব। তিনি ১৯৪১ সনেও লিখে গেছেন, তোমার জন্ম ১৯৩২-৩৩ সালে। মন কখন একটা চেহারা নেয়, ধরা যাক, চৌদ্দ পনেরো বছরে? কালের আসল তফাত তা-হলে যেটা দাঁড়াল, সেটা চার-পাঁচ বছরের বেশি না। সুতরাং যুগের পার্থক্যটা

একটু মতলব মতই বাড়াচ্ছ। আসল কথা কী জানো, আসল কথা আমরা মূলত সায়েবদের মোসাহেবের জাত। জেনে গেছি, রবীন্দ্রনাথকে মাথায় করে সাহেবরা দিনকতক তাধিন্‌ধিন্‌ নেচেছিল, বেশ কিছুকাল আর নাচছে না। সুতরাং কবিকে কবি বলা এদেশেও আর ফ্যাশ্‌নেব্‌ল থাকছে না। কিছু মনে কোরো না, তুমিও সেই ফ্যাশনের শরিক বা শিকার হয়ে গেছ।

একজন একটু অপমানিত বোধ করছিল, তার পিঠ চাপড়ে বললুম, দুঃখিত হয়ো না। সায়েবদের মোসাহেবি বা হালের ফ্যাশন, এ দুটোই একমাত্র কারণ না। এর একটা গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। সন্তান মাত্রেই পিতৃদ্বেষী হয়ে থাকে, সর্বকালে। রবীন্দ্রনাথ নিজে মাইকেলকে বিশেষ বরদাস্ত করতেন না, বস্তুত অব্যবহিত আগেকার কবিকুলের মধ্যে এক বিহারীলাল-সম্পর্কেই যা-হোক কিছু প্রশস্তি গেয়ে গেছেন, নতুবা তিনি পূর্বপুরুষেরই দ্বারস্থ বিশেষ করে—উপনিষদ থেকে বৈষ্ণবকাব্য। সাবালক ছেলে মাত্রেরই পিতৃ-ঋণ অস্বীকার করার ঝোঁক দেখা যায়।

অন্যজন : তাঁর জগৎ আমার নয়।

—বলে দাও তো কার জগৎ কার? সাচ্চা শিল্পীমাত্রেরই ভিতরে একটা করে জগৎ থাকে, যার-যার জগৎ, তার তার। সবাই এক-একটি জগৎপতি।...যাক, বলো অন্য কোন্‌ কবির জগতে স্বচ্ছন্দে বিহার করে থাক?

—কেন, জীবনানন্দ দাশ!

—তিনি মহৎ কবি। সন্দেহ নেই তাঁর পরবর্তী প্রায় বিশ বছরের কাব্য-রচনাকে তিনি প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু বৈচিত্র্য আর বিপুলতায় সত্যিই কত বড় তিনি? আজ পষ্টাপষ্টি তারও একটা বিচার হয়ে যাক। তাঁর কাব্যে একটি মাত্র ঋতু; হেমন্ত। একটি মাত্র রঙ; ধূসর। অথচ যাঁকে 'চলবে না' বলে বরবাদ করেছ, তাঁর কাব্যে সব ঋতু, সব রং পাবে। অর্কেষ্ট্রার প্রবল বৈভবে তোমরা

ক্লান্ত জানি। কোন দিন ভাল করে শুনলেও না। কিন্তু একতারাটি নিরন্তর বাজলেও তো একঘেয়ে লাগে? একালের কবিতায় তাই একটি কি দুটি সুর চমৎকার বাজল, অনেক সুর অশেষ ঝংকারে বাজল না, বাজছে না।

দু'জনেই প্রবল বেগে : আমাদের এই যন্ত্রণায় আক্রান্ত, শূন্যতায় ক্লান্ত জর্জরিত জীবনে অন্য কোন ঋতু নেই, একটিই সুর—বিষাদের, ক্রোধের, প্রতিশোধের।

আমি : বলে বলে, শুনিয়ে শুনিয়ে তোমরা সাজানো কথা কয়টাকে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছ। ধাপ্পা দিচ্ছ, অথবা নিজেদেরও একটা ধাপ্পার ফেরে ফেলে রেখেছ। ভাই, বুকে হাত দিয়ে বল তো, তোমরা কি সর্বদাই ক্লান্ত, সততই নেতিয়ে কিংবা ফোঁস ফোঁস ফণা তুলে ফুঁশছ? তোমরাও দেখি, প্রেম-ট্রেম দিব্যি কর, বিয়ে-থা বাচ্চা সবই হয়। তার মানে, তোমরাও কখনও কখনও পুলকিত, রোমাঞ্চিত, উল্লসিত, বিস্ফারিত—সব হয়ে থাক। তোমরাও জর্জরিত জীবন থেকে অন্য জগতে যাও। চাঁদ দেখে কালেভদ্রে নিশ্চয় চমকাও।

একজন : ওঁর গান অবশ্য ভাল লাগে, আমিও গাই।

আমি : গানে যিনি, কবিতাতেও তো তিনি। তিনিই তাঁর গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে। একই মন, একই সমর্পণ, একই বিশ্বাস। এই মনটাকে এখানে যদি গ্রহণ করতে পার, অন্যখানে তবে আটকায় কেন। হয় তোমাদের অনুভূতিতে, নয় তোমাদের উচ্চারণে কোথাও আত্মখণ্ডন আছে। গানে এসে ধরা পড়ে যাও।

অন্যজন, সবেগে মাথা নেড়ে নেড়ে : ওঁর গানও আমার ভাল লাগে না। আমি বরং বেশি আনন্দ পাই পল্লী-সংগীতে, কিংবা ক্লাসিক্যাল গানে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বড় পরিচিত-পুরোনো হয়ে গেছে।

আমি : কোন্‌টা পুরনো হয় না? প্রেমিকার শরীর, এমনকী তার ভিতরের সত্তা? পরিচয়ে পরিচয়ে সবই পুরনো হয়।

একটি পল্লীসংগীত অনবরত শুনে এসে বোলো তো নিত্য-নূতন উন্মোচন তার মধ্যে কতখানি পাও ? আর রাগসঙ্গীতের কথা বোলো না। তুমি ওটা জানো না। জানলে তাঁর অসংখ্য গানে সুর আর বাণীর প্রয়োগ দেখতে পেতে।

প্রথম জন : গানের কথা থাক। যতই আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলুন, আসল কথা, যার মধ্যে আছি, রোজ যা দেখি, যুদ্ধ, হিংসা, অভাব, অশান্তি, তাঁকে তার সব কিছু থেকে দূরে, যেন এক অলীক ধ্যানলোকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই।

আমি : এটাও ঠিক হল না। তাঁর কালেও যুদ্ধ, হিংসা, হাহাকার ইত্যাদি বিস্তর ছিল, সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা নেহাত কম নয়! কুৎসিত-কুরূপকে তীব্র বিদ্রূপের চাবুক তিনি বারবার মেরেছেন। বরং ক্লীবের মত আধো-আধো উচ্চারণে প্রতিবাদ জানাতেন না। কচিসংসদের চিঁ চিঁ ঢঙে "ব্যথা ব্যথা"-ও বলতেন না। পুরুষের মত প্রকৃতিকে যিনি ভোগ করতে জানতেন ইন্দ্রিয়জ প্রায় সব ক'টি অনুভূতি দিয়ে, পুরুষের মতই তিনি আঘাত হানতেন নীচতা, ক্রূরতা আর হিংসাকে—মানবতার প্রতিবাদী সব শক্তি আর বৃত্তিকে। উভয়তই তিনি পুরুষ।

একজন, সহর্ষে : সেই রবীন্দ্রনাথই তো আমাদের কাছের মানুষ, তাঁর সঙ্গে বিবাদ নেই। তাঁর সান্নিধ্যে স্বস্তি পাই, নিজের বলে চিনতে পারি।

আমি : আবার ভুল করছ। অন্য রবীন্দ্রনাথও তোমার নিজের। অন্য সময়ের। যেমন ধর, আমরা যা উপার্জন করি, তার কিছুটা রোজকার বাজারে খরচ করি। পাবলে কিছু তুলে রাখি। সঞ্চয়ের রহস্য তো এই! তাঁর দানের কিছু অংশ নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যহের কাজে লেগেছে, অনেকটাই আবার তোলা আছে। পরে, সারা জীবনে, দুঃখে-সুখে তা-ও কাজ লাগবে।

অন্যজন : তবে তাঁর প্রভাব অনুভব করিনে কেন।

আমি : একবার এর জবাব তো দিয়েছি, আবার সেই প্রভাব? প্রভাব নেই, নিশ্চয় করে কি বলা যায়?

সে : যায়। প্রভাব নেই।

আমি : তোমার এই চেহারাটা কার?

সে : কেন, আমার!

আমি : জোর করে কি বলতে পার? তুমি তো জানো না, এর কতটা তোমার বাবার! তোমার ভুরু জোড়া, চিবুকের ওই ভঙ্গি, কথা বলার ঢঙ—অনেক কিছুই হয়ত পেয়েছ তোমার বাবার কাছ থেকে। অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতে। না জেনে সবটাই তোমার নিজের বলে ধরে আছ। ছ্যাখ, এখন তুমি যুবা, এখন দুটো ছবিতে খুব একটা মিল চোখেও না পড়ে যদি, তবে পঞ্চাশে পড়ে তোমার প্রৌঢ় পিতার ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো! দেখবে প্রায় সবটাই মিলে যাচ্ছে। তাঁর কবিতা নাওনি, কিন্তু হয়ত তাঁর গদ্য নিয়েছ। এই যে আজ আমার সঙ্গে কথা বলছ, তুমি তো জান না, এই বাক্‌-বিন্যাস, শব্দরুচি তাঁর কিনা। এর অনেক শব্দ তিনিই হয়ত প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, তুমি জান না।

দু'জনেই, ক্রুদ্ধ : তার মানে আপনি বলতে চান, আমরা তাঁর মত করেই লিখি?

আমি : না। লেখো না, লেখা উচিত না, কোনও লেখক লেখে না, এমন-কী আমিও তো তাঁর মত করে লিখি না। তাই বলে ভালবাসতে বাধছে কোথায়। পিতার অনুরক্ত যোগ্য পুত্র তাঁকে শ্রদ্ধা করে, সেটা তার কর্তব্য, কৃতজ্ঞতা। কিন্তু তারও স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে; আছে আত্মসম্মান বা অহংকার—বাবার অফিসে সে চাকরি নেবে না।

*

ওরা চুপ করে রইল। হয়ত মেনে নিল, হয়ত-বা নিল না। আস্তে আস্তে বললুম, "ছ্যাখ, পশ্চিমের শেয়ার-বাজারের ওঠা-পড়ার

সঙ্গে আমাদের দরদাম তুলে-ফেলে লাভ কী। আমাদের হিসাব আমাদের। রবীন্দ্রনাথকে ছেঁটে দিলে পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের কিস্‌সু আসে-যায় না, প্রায় সবই থাকে। যায়-আসে না তাঁরও, কেননা তিনি এখন সব-কিছুর ঊর্ধ্বে, বাইরে। লোকসান একমাত্র আমাদের —একে তো তাঁকে বাদ দিলে আমাদের সাহিত্যের চেহারা গজভুক্ত কপিত্থের মত দেখায়, অবশিষ্ট থাকে অল্পই; তাছাড়া আমাদেরই একটা বিরাট সোনার-খনি বুজে যায়, দরিদ্র হয়ে যাই আমরাই।

এই বছরেই বিপ্লব ?
হোক না !

নতুন বছরের শুরুতেই (এই লেখার সময়) ভাবছি, পাতে আর শুক্তো দেব না, দুর্মুখ বলে ইতিমধ্যেই তো বিস্তর বদনাম জুটেছে। তার চেয়ে আসুন, এই দিনে আমরা—না পণটন করা নয়, করলেও কি রাখতে পারব ?—সবাই মিলে বুঁদ হয়ে যাই। কিসে ?—স্বপ্নে। পরে অসম্ভব কোনও ফসল তোলা হোক বা না হোক, বীজ তো এখন বপন করে চলি !

এই দিনটিকে তাই স্বপ্নের জন্যে আলাদা করে রেখেছি। আজ আমি স্বপ্ন দেখছি। অলীক সব আশার পায়রারা ঝট্‌পট্‌ করছে মনের খোপে খোপে। নতুন বছরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চেয়ে ভাবছি, এই বছরই হয়ত-বা একটা বিপ্লব ঘটে যাবে। ঘটবে কি ? আহা, ঘটে যদি ঘটুক না।

কেউ কেউ চমকে উঠলেন বুঝি ? এই বইয়ের শিয়রে যার স্বাক্ষর সেই লোকটার—মানে আমার—মুখে বিপ্লবের বুলি ? সর্বনাশ ! ভূতের মুখে রামনাম শুনে চমকাবেন বৈকি।

কিন্তু হলপ করে বলছি, পরিবেশের রুগ্নতায় জর্জর আমিও বিপ্লব চাইছি। নতুবা বাঁচবার কোনও রাস্তা নেই বলে। হয়ত একটু অচলিত ধরনের বিপ্লব—আমাদের আচরণে মনে। সেই বিপ্লব আমাকে সম্মোহিত করে ফেলছে নতুন বছরের প্রথম দিনে। স্বপ্নের আকারে।

*

দেখছি, উত্তেজিত যাত্রীরা হানা দিয়েছেন রেলের স্টেশন মাস্টারের ঘরে। শশব্যস্ত, ত্রস্ত মাস্টারমশাই বলছেন, "আফিসটা তচনচ করবেন বুঝি ? তা হলে আমি বরং আগে বেরিয়ে যাই—" আর

যাত্রীরা তাঁকে বাধা দিয়ে বলছেন—"না। আগে দেখুন, কাদের ধরে এনেছি।"

চোখ পিটপিট করে চাইছেন স্টেশনমাস্টারবাবু, ভালো দেখতে পাচ্ছেন না, থতমত খেয়ে বলছেন—"এঁরা গার্ড আর ড্রাইভার বুঝি? বেদম প্রহার দিয়েছেন?"

যাত্রীরা আবার বলছেন "না। চেহারা দেখে টের পাচ্ছেন না? এরা চোর। নেতাদের ভাষায় যাদের বলা হয় সমাজবিরোধী—অবিশ্যি যদি নিজের দলের না হয়। আমরা অত বড় বড় বাংলা বুঝিনে। বুঝি যে, এরা স্রেফ চোর। তামার তার সরাচ্ছিল। রেল-পুলিশ ডেকে তাদের হাতে এদের তুলে দিন। তবে চেয়ে দেখুন, বেদম মার-টার দিইনি। শুধু ধরে এনেছি।"

স্টেশনমাস্টার এতক্ষণে ঘষে ঘষে সাফ করতে পারলেন চশমার কাচ। ভালো করে তাকালেন।—"ধরলেন কী করে?"

ততক্ষণে সামনে এগিয়ে এসেছেন যাত্রীদের একজন মুখপাত্র। —"আমরা এখানে একটা লাইনরক্ষী দল তৈরী করেছি যে, জানেন না? যাতে সিগন্যাল অবিকল থাকে, তার-টার চুরি না যায়। এ-দায় রেল-পুলিশের, তাই বলছেন? সে তো মশাই সব জায়গাতেই তাই। পাহারাদার আছে, তবু কি পাড়ায় পাড়ায় আমরা ডিফেন্স্ পারটি গড়ি না? এটাও সেই রকম। ভেবে দেখলাম কি না, এটা আমাদেরও দায়!"

"ঠিকই তো, ঠিকই তো," মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিলেন স্টেশনবাবু—"আপনারা নাগরিক। আর রেল হল গিয়ে জাতীয় সম্পত্তি।"

"দূর মশাই। জাতীয় সম্পত্তি-টম্পত্তি বুঝি না। বুঝি যে, টাইম-মত আমাদের অফিসে যাওয়া চাই। নইলে লেট হবে। ছুটি কাটা যাবে। কারও কারও মাইনেও। নিজেদের গরজেই তাই তুলে নিয়েছি এই দায়। কাজটা পালা করে আর ভাগ করে নিয়েছি।"

"ঠিক ঠিক", দেয়ালঘড়িটার শব্দের সঙ্গে তাল দিয়ে স্টেশন-মাস্টার বলতে থাকলেন "ঠিক ঠিক।"

যাত্রী-জনতার সেই মুখপাত্র তখন কপালের ঘাম মুছে প্রদীপ্ত মুখে বললেন, "আজ চোর ধরে এনেছি! ঠিক মত কাজ চালিয়ে যেতে পারি তো আর-একদিন ডাকাত ধরে আনব। রাত্তিরে সাইডিং-এ যারা ওয়াগন ভাঙে না?—সেই ডাকাত।" তারপরেই তিনি আরও উদ্দীপিত হয়ে বলে উঠলেন "তবে মাস্টারমশাই, আপনাদেরও একটা কথা দিতে হবে। যদি আমাদেরই ভিতর থেকে কেউ কেউ কোনও দিন হঠাৎ আপনাদের ওপর হামলা করে, আপনারা সেই-দিন সবাই মিলে কাজ একেবারে বন্ধ করে দেবেন। দেখবেন, একটু সাহস দেখান যদি, আমাদেরই মধ্য থেকে অনুতাপ ক্রমশ কঠিন আকার নিয়ে আপনাদেরই নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি আর রক্ষাকবচ তৈরী করে দিচ্ছে। পড়ে পড়ে মার খেলে আর হবে না। কোনও সারভিস রুল আপনাদের বাঁচাবে না। নিজেদের স্বার্থে একটুখানি সাহস তো শুধু। পারবেন না?"

*

এই বিপ্লব। চিন্তাধারায় সংগঠনে। যার স্বপ্ন দেখছি। যাকে রেলের ইয়ার্ড ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে দিচ্ছি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।

একটি কলেজে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ফটক বন্ধ। সামনে বিমূঢ় ছাত্রদের জটলা। কাছেই অধ্যক্ষের বাসা, নিজেকে নিয়ে গিয়েছি সেখানে। তাঁর কাছে শুনলাম, আগের দিন প্রহৃত হন এক অধ্যাপক। তারপর অধ্যাপকেরা সবাই মিলে স্থির করেছেন, তাঁরা আর পড়াবেন না, যতদিন না—

"যতদিন না কী? ছাত্ররা···?"

"শুধু ছাত্ররা কেন।" গম্ভীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অধ্যক্ষ বললেন, "যতদিন না অভিভাবকেরাও আসছেন একে-একে। দায়-দায়িত্ব

গ্রহণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সত্যি বলতে কী, দায় আর স্বার্থ তো তাঁদেরই বেশি।"

কথা না বাড়িয়ে গেলাম একটা মোড়ে, যেখানে নিত্য খবরের কাগজ নামানো হয়। সেখানেও আশাহত কিছু মানুষের ভিড়। কাল এখানে খবরের কাগজের একটা বানডিল পোড়ানো হয়, আজ প্রতিবাদে সেই কাগজ পাঠানো হয়নি। সেই জনতার মধ্য থেকেই একটি অঙ্গীকার আকার নিল, শুনতে পাচ্ছি, "আমরা পাঠক। রোজ এখানে আমরা ক'জন দাঁড়িয়ে থাকব। যা পড়তে চাই আর যা জানতে চাই, যদি বিশ্বাস করি সেই পড়া আর জানাটা জরুরী, তবে তার বণ্টন-বিতরণ ব্যবস্থায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সেই যৌথ দায়ও আমাদেরই নিতে হবে। যা গণরোগ তাকে জনরোষ বলে চলতে দেব না।"

হতে তো পারে! হয়ত এই বছরই দেখতে পাব, অফিস টাইমে চৌরাস্তায় একটা বিকল বাস। মাঝ রাস্তাতেই সেটাকে ফেলে চালক কোথায় চলে গেছে। রাস্তার একপাশে বাসটাকে সরিয়ে রাখার সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও দেখায়নি। চারধারে ট্রাফিক জমে বরফ, কানে তালা-লাগানো ভেঁপু, অথচ নির্বিকার পুলিশ এক পাশে দাঁড়িয়ে খৈনি টিপছে। কিন্তু কী আশ্চর্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি—সেই জমজমাট ভিড় থেকেই বেরিয়ে এসেছেন জনকয় কর্মঠ যুবক, বাসটাকে ঠেলে রাস্তা সাফ করে দিচ্ছেন, খুঁজে এনেছেন সেই দায়িত্বজ্ঞানশূন্য চালককে, আর সেই নির্লিপ্ত নিমীলিতনেত্র পাহারা-ওয়ালাকেও এনেছেন টেনে। তাদেরও বাধ্য করেছেন হাত লাগাতে। অন্য কোনও বাস যদি বেপরোয়াভাবে পাশ কাটাতে যায়, তাকেও থামানো হচ্ছে জোর করে।

মাপ করবেন, আমি নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিক। জোরজবরদস্তি বা হিংসা এমনিতে আমার রুচিতে বরদাস্ত হয় না। কিন্তু এই রাজ্যের সব ঘটনা তো আর আমার পছন্দ-অপছন্দের মুখ চেয়ে চলে

না। জোর-জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি হরবখ্‌ত হয়। একটি বা দুটি ক্ষেত্রে এই রকম কিছু ঘটলেই উদাসীন নির্বিকারদের যথেষ্ট শিক্ষা হবে; এমনিতে যদি না জাগে, তবে ঘা মেরে নাগরিকতা বোধকে জাগাতে হবে বৈকি, নতুবা টেঁকা যাবে না।

*

ইতস্তত ধার করে কুড়িয়ে কাচিয়ে আমার বন্ধু মোটামুটি বাসযোগ্য একটি বাড়ি তৈরী করেছেন। নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে দেখি, সেখানে যাওয়া যায় না। রাস্তা মানে ফাঁদ, সেখানে হাঁটা মানে হাড়গোড়ের ফ্র্যাকচার, আর রাত্তিরে বাতি জ্বলে না।

সমাগত অভ্যাগত, তার মধ্যে তাঁর প্রতিবেশীও কয়েকজন, এবং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আমার বন্ধু সেদিন অমোঘ ঘোষণাবাণী উচ্চারণ করলেন: "ঠিক করেছি, আমরা এবার থেকে আর ট্যাক্স দেব না। বাড়ি মেরামত না করে দিলে ভাড়াটেরা যেমন ভাড়া বন্ধ করে, আমাদের পদ্ধতিও অবিকল তাই। রাস্তা আর আলো আগে—তবে ট্যাক্স।" সর্বংসহ নাগরিকদের একজনের গলায় শুনছি অবিশ্বাস্য এক উচ্চারণ, আর তাঁর প্রতিবেশীরা সোৎসাহে সরবে সমর্থন জানাচ্ছেন।

তাঁদেরই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে খবর পেলাম, টেলিফোনের বিল দেওয়াও বন্ধ করেছেন গ্রাহকেরা একযোগে। বলছেন, "এত ক্রশ-কনেকসন, নো-রিপ্লাই, ভুয়া এনগেজ্‌ড্‌ সিগন্যাল সহ্য করব না। ১৯৯ ডায়াল করে কখনও সাড়া পাই না কেন, তার কৈফিয়ত চাই আগে। বিল্‌-এর অঙ্কও ঠিক-ঠিক হওয়া চাই।"

এই বছরই কি "হাসপাতাল চাই", "ওয়াটার ওয়ার্কস চাই" বলে নানা শহরে বিক্ষোভ দেখা যাবে? অপেক্ষায় আছি। যদি হয়, তবে রাজনৈতিক কারণে একটি-বা-দুটি হরতালেও সম্মত আছি। যাঁরা ডাক দেবেন, তাঁরা বাড়ি এলে, বলা যায় না, হয়ত বা অন্তত এই কথাটা বলার সাহস হবে: "দেখুন, বন্‌ধ্‌ হবে ঠিকই। কাজে যাব

না। কিন্তু দয়া করে হরতালের সাফল্য দিয়ে সমর্থনের মাপ নিতে যাবেন না। নিলে ঠকবেন, ঠকাবেন। জানেনই তো, আপনারা কেন, যে-কোনও দশটি বালক ডাক দিলে একালে হরতাল 'সম্পূর্ণ' হয়। আমার যদি একটা পানের দোকানও থাকে, আমি এই দিনে তার ঝাঁপ খুলব না আপনারা জানেন কেন। আমার ছেলেমেয়েকে সেদিন স্কুলে পাঠাব না—আপনারা জানেন কেন। এর মধ্যে সমর্থন-অসমর্থনের কোনও কথাই ওঠে না।"

*

এইসব বলব, বলতে পারব, অর্জন করব এই বৈপ্লবিক সাহস—এই বছরে। বলব যে, কাজ বন্ধ করা অতীব সোজা, শক্ত চালু রাখাটাই। (কেনেডি নিহত হওয়ার দিনও আমেরিকায় হরতাল হয়নি, নির্ভয়ে তা-ও বলে দেব নাকি, কিন্তু ঝুঁকি আছে। যদি কেউ বলে ওটা "ইয়াংকিয়ানা!")

ভোটে নির্বাচিত সরকারকে সমালোচনা করলে চক্রান্ত করা হয় না, পার্টিকে তো করাই যায়—গণতন্ত্রের মর্চে ঘষে তুলে তার এই বিস্মৃত অর্থ এই বছরে আবার উজ্জ্বল করে তোলা যাবে না? আগেই বলেছি অসম্ভব সব স্বপ্ন দেখছি যে! এই বছরে হয়ত নির্বিঘ্নে দেশীয় নেতাদের জীবনী-চিত্র দেখতে পাব, আর, বলা যায় না, ভিয়েতনামের কথা ভাবব বৈকি, কিন্তু তার সঙ্গে ভারত-ভাবনাকেও মেলাব!

কয়েকটি
কড়া-ডোজ কথা

দম নিয়ে ফের জল ভরে নেব ইঞ্জিনে? সিটি দিয়ে ইস্‌টিম ছাড়ব? লাভ কী, এগোবে না কিছু। কালি আর ধোঁয়া খালি, ছাই পড়বে নীচে, নিজেদেরই গায়ে।

অথবা পিস্তলে গুলি ভরে কতকাল চালাব এই চাঁদমারি? লক্ষ্য বস্তু কিছু তো নেই, থাকলেও তার 'সাড়' নেই। নিষ্প্রাণ লক্ষ্যকে ভেদ করতে যাওয়া নিষ্ফল। খামোখা কারতুজ নষ্ট।

আমাদের সব কিছু সয়ে যাওয়ার অসীম শক্তির খুরে খুরে দণ্ডবৎ। বলছি না যে আমাদের রগে রক্তে রাগ নামে রিপুটি নেই। আছে, বিলক্ষণ ছলাৎ করে। তবে বান ডাকে না। যদি বা ডাকে তো রাজনীতির খোঁচায় বা গরজে, নিজে থেকে না।

এমন নয় যে, আমাদের দীর্ঘশ্বাস নেই। আছে, তবে জড়ো হয়ে ঝড় বয় না। যদি বইত তবে উড়িয়ে নিত অনেক মরা ডাল, ভাঁওতা, ভড়কি আর জঞ্জাল।

হাইড্র্যান্টে জল জমে, খোলা ফোয়ারাও ছোটে এখানে-ওখানে তাতে কাদাই বাড়ে। সেই হোজ-পাইপ কই, যার তোড়ে সব ভেসে যাবে?

সব ক্রোধ যদি নঞর্থক না হত, কেবলই নেতি নেতি না বলে যদি সদর্থক কোন-কিছুর প্রতি ধাবিত হত, তবে এতদিনে একটা-না-একটা অধ্যায়ের হত ইতি, কোন-না-কোন সমস্যার হিল্লে নিশ্চয়ই হত।

*

আসুন, আপনাদের আর-একটু ভাবাই। কাউকে বা আর-একটু চটাই। কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা মালুম করিয়ে দিতে চাই।

দেখুন, বর্ষাকাল চলছে, (এই লেখার সময়), যদি এই শহরে গৃহপতনে মৃত্যুর আরও খবর কানে আসে, অধীর হবেন না। বিপজ্জনক বাড়িগুলি সব নথিভুক্ত বা ধূলিসাৎ করেনি বলে কর্পোরেশনকে ধিক্কার দেবেন না। ভারপ্রাপ্ত দফতর কাজে গাফিলতি করছে ঠিক, কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি না করত, যদি সত্যিই সক্রিয় ও তৎপর হত, তা-হলে ধরা যাক, বিপজ্জনক বা মানুষের পক্ষে আবাসযোগ্য বাড়িঘরের একটিও আস্ত থাকত না, কিন্তু পরিস্থিতি হত আরও সাংঘাতিক। লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাত-দিন দুই-ই কাটাতে হত রাস্তায়। কারণ এই শহরে গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পগুলি যে একদম সফল হয়নি! মাথা গোঁজার সমস্যা পাগল করে দিত। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের চেয়ে বরং নড়বড়ে বাড়িগুলি থাকুক, বস্তিগুলি কলকাতার কপালে এয়োতির সিঁদূরের মত অক্ষয় হোক! এ-মুলুকে ভূমিকম্প তেমন হয় না—ঈশ্বরের আশীর্বাদ—ঐরাবতী মাতনে মাঝে মাঝে মাতে ওই এক বর্ষা। মাথাগুলো রাখা যাচ্ছে এই যথেষ্ট, সেগুলোকে বাঁচাতে কী আর করব, হাত দুটি তুলে রাখব উপরে; কৃতার্থ-কৃতজ্ঞ আমরা কাতর প্রার্থনা জানাব, ধস্ যেন না নামে, ছাদ যেন হুড়মুড় করে ভেঙে না পড়ে। এই অদৃষ্ট, আপনার, আমার।

অপিচ, ভেবে দেখুন, ভাঙতে হলে তো সবই ভাঙতে হয়। গোটা উত্তর কলকাতার অলিগলি সহ মফস্বলের জেলা আর মহকুমা-শহর-গুলোর বেশির ভাগ, সভ্যজগতের মাপকাঠিতে বস্তুত বস্তি ছাড়া আর কী! ঠক বাছতে গাঁ-য়ের পর গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। অতএব নেই-মামাদের চেয়ে কানামামাদের আঁকড়ে থাকব। অবস্থা গতিকে এই আমাদের বিধিলিপি।

*

আমি তাই বাজার থেকে পচা মাছ এলেও ক্ষেপে যাইনে। মাইনেকরা ফুড ইন্সপেক্টর প্রভৃতি তো আছেন, তাঁরা অখাদ্য খাদ্যগুলিকে নষ্ট করেন না কেন? তওবা, তওবা, তা-হলে—একেই

তো মাছ মেলে না—আরও ঘাটতি দেখা দেবে। রেশনের পচা চাল, যাবতীয় ভূষিমাল সম্পর্কে একই কথা। খাদ্যাখাদ্য বিচার করতে বসলে তো হরিমটর। 'আনফিট ফর হিউম্যান কনজামসন' এই লেবেল মেরে এক কণা খুদও সুতরাং নষ্ট করা চলে না। সম্পন্ন সভ্য-দেশগুলি যা করে, আমাদের তা করা সাজে না। বুঝতে পেরেছেন, কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ?

এই নৈরাশ্য থেকে মুখ ফেরাতে যারা গেলাসে মুখ দেয়, তাদের প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি। মদ্যভ্রমে বিষপান করে যারা প্রাণ দেয় (সম্প্রতি কয়েক শ'-য়ে শ'-য়ে লোক দিয়েছে), তাদের স্মৃতিতে বরং চাঁদা তুলে মঠ বানাব, কিন্তু প্রাণহরণের জন্যে যারা দায়ী তাদের দায়রায় সোপর্দ করার ব্যাপারে কদাচ সায় দেব না। ওদের কসুর কী, প্রক্রিয়াটাকে একটু ত্বরান্বিত করে দিয়েছে, এই যা। অসুখী, হতাশ যারা দু'দণ্ড শান্তি চেয়েছিল, তাদের বরং চিরশান্তির রাস্তাটা খোলসা করে দিয়েছে। শাস্তি কী, এদের, তো, আমার বিবেচনায় পদ্মগন্ধে ভুরভুর কোনও ভূষণ পাওয়া উচিত।

যা শুনলেন, তারপর দেখুন, অতঃপর কোন দিন যদি দেখেন কোনও সায়েব ক্যামেরা নিয়ে নোংরা রাস্তাঘাট ইত্যাদির ছবি তুলছে, তবে তাকে তাড়া করবেন না। নরকবাসে যাদের লজ্জা নেই, নরকের প্রচারে তাদের 'গেল গেল' চিৎকার সাজে না। ওটা উটপাখির ধরন, ওটা একই সঙ্গে মূর্খতা আর ভণ্ডামি। সত্যিই যদি লজ্জাবোধ থাকত, তবে কবে ওইসব গ্লানি আর গলিত আবর্জনা দূর হত—একটি দুঃসহ স্থিরচিত্রের মত যা ঝুলছে। থাকলে দোষ নেই, জানাজানি হলেই যত হাহাকার ? আমাদের সম্মানবোধটা খুব টনটনে বটে! ক্ষতগুলি সরিয়ে ফেলুন, ওরাও ছবি তুলতে আসবে না।

তার চেয়েও কঠিন এই সত্যটা জেনে রাখুন, জানাজানি হচ্ছে বলেই বিদেশ থেকে যা-হোক কিছু ভিখ্ মিলছে। ভিক্ষাই হল শিরদাঁড়া আমাদের ইকনমির। সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত বিদেশীরা ওই সব ছবি

দেখবে, তবেই তো পাষাণ-হৃদয় গলবে! আমাদের সফরী মিনিস্টার মহাশয়দের মুখেও এই এক করুণ মাধুকরী। কুষ্ঠরোগীও ঘা খুলে দেখালে তার ঝুলিতে দু'চারটে নয়া পয়সা পড়ে।

*

খুব খারাপ লাগছে? কিন্তু সব রকম খারাপেই তো আপনারা অভ্যস্ত। দুনিয়ার আর কোন্ দেশে ট্রামে-বাসে নিত্যযাত্রীরা এমন বাদুড় ঝোলে। দেশসুদ্ধ লোক বিগড়ে গেল বলে যাঁরা চেঁচান, তাঁরা জানেন না, অফিস টাইমে একবার লালদীঘি এলাকায় যাওয়া, আর অফিস শেষ হলে অন্ধকূপ যান-বাহনে রড্ ধরে, যেন ফাঁসিকাঠে লটকে লটকে ফেরা—একটা গোটা জাতকে তেতো, নীরস, কর্মবিমুখ করে দেবার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট। ওই গলদঘর্ম অভিজ্ঞতার পর কার চিতে সাধ যায় কাজের বাণ্ডিল নিয়ে পড়তে? যাঁর যায়, তিনি নির্বিকার, নির্বিকল্প মহাপুরুষ, তাঁকে নমস্কার। সাধারণ মানুষের ঘাম শুকোতেই দু' ঘণ্টা যাবে।

ওই একই কসরত করার পর বাড়ি ফিরে পরিজনকে কাছে টেনে নিতে পারেন ক' জন স্নেহময় পিতা, প্রেমময় পতি বা পত্নী, ক' জন জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বা ভ্রাতা।

ভালবাসা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এ একটি ক্রমশ-প্রকাশিত করুণ কাহিনী। টান থাকছে না কাজে, টান থাকছে না পরিবারে। একটি তিক্ততা নিয়ে আমরা যাচ্ছি অফিসে, একটি তিক্ততা নিয়ে ফিরে আসছি ঘরে।

সকল কল্যাণের যাঁরা কাণ্ডারী, তাঁদের কারোই দৃক্পাত নেই এই বিমর্ষ সামাজিক সত্যের প্রতি। থাকলে চিত্রটি একটু আলাদা হত। রাঁধতে বসে তরকারী পুড়িয়েছেন কেউ, না রেঁধেই কেউ বা বড় রাঁধুনি।

পরিবহন দিয়ে শুরু করেছি, এবারের লেখাটা পরিবহনের চৌহদ্দিতেই রাখি।

যদি দূর—দৃষ্টি থাকত কাণ্ডারীদের, তবে স্বাধীনতার পরে তাঁরা অচিরেই টের পেতেন, ট্রাম-বাস ছাড়াও তৃতীয় একটি সার্বজনীন যানবাহন ব্যবস্থা চাই এই ত্রিশ লক্ষ মানুষের শহরে, যার জনসংখ্যার জোয়ার পূর্ণিমা-অমাবস্যা না মেনে ফুলে ফেঁপে উঠছে। সে-দিকে না গিয়ে তাঁরা যে-তুটি ছিল তার একটিকে ধরে টান মারলেন। বাঘমার্কা বাস বেরুল। কালে কালে দেখা গেল সেটি নখদন্তহীন কাগুজে বাঘ। ঠেকায় পড়ে শহর কলকাতায় যে প্রাইভেট বাস ফের ডেকে আনতে হল, সরকারী রাষ্ট্রীকরণ নীতির ব্যর্থতার সেটাই তো একটা কটকটে প্রমাণ! সততা থাকলে কর্তারা কথাটা স্বীকার করতেন।

অতঃপর ট্রাম। সেটাও ফাঁকা সরকারী পকেট আরও ফাঁক করে আধ-খেঁচড়া রাষ্ট্রীকৃত করা হল। মাসের পর মাস ডাহা লোকসান। অথচ মুখ ফুটে এ-কথা কেউ বলছেন না যে, কলকাতার মত মাপের শহরে ট্রাম নামক যান গরুর গাড়ির মতই বেমানান। ওরা তু' ফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই দাঁড়ায়, যখন দাঁড়ায় না, তখন সরু ঘিঞ্জি রাস্তায় ট্র্যাফিক আটকায়। ওদের কবে বিদায় দিয়েছে লণ্ডন, ন্যু-ইয়র্ক, এমন-কী মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই।

তবু কলকাতা থেকে ট্রাম তোলা যাবে না, পর্যায়ক্রমে এক-একটি রুট থেকে ওই ঘটাং-ঘটাং বালাই বিদায় করার কর্মসূচী কেউ মুখেও আনবে না। তার কারণ রাজনৈতিক স্বার্থ আছে। তার আরও একটা কারণ, প্রত্যেক ট্রামকর্মীর একটি করে ভোট আছে। (এদের বিকল্প কাজের সুযোগ দেওয়া চলে, ফাঁকা রাস্তায় অন্য যান-বাহনের চলা সহজ হয়, বাড়তি দ্রুতগামী বাসও চালানো যায়, কিন্তু সে-কথা বলে কে। ট্র্যাফিক-প্রব্লেম নামে যে-জুজুটিকে আমরা জীইয়ে রেখেছি সে যে অক্কা পায়! দেখুন মশাই, আমি তুনিয়ার ঢের ঢের শহর দেখেছি, সে-সবের তুলনায় আমাদের ট্র্যাফিক একটা প্রব্লেমই নয়। গরীব দেশ, আমাদের এখানে মোটরগাড়ি ক'টাই বা! আরও বেশি

রাস্তাকে অফিস-আওয়ারে একমুখী করে দিন, পার্কিং-এর নিয়ম কড়া করুন আর একটু, চালানোর কায়দায় শৃঙ্খলা আনুন, সেইসঙ্গে বিদায় দিন কেঁচোগতি সব বাহন, যথা ঠেলা রিকশা ইত্যাদি। দেখবেন অন্তত দশ বচ্ছরের মত এই তল্লাটে ট্র্যাফিক-প্রব্লেম জলবৎ তরল।)

*

সেই সঙ্গে বিকল্প একটি প্রধান পরিবহন-ব্যবস্থা অবশ্যই চাই। কিন্তু দেখুন, বিশ্বাস করবেন না। যদি শোনেন, এই শহরে ভূগর্ভ রেল চালু হবে, গুজবে কান দেবেন না। ওটা রসিকতা। মহানগরীর ন-যযৌ অতিষ্ঠ মানুষদের আশা নিয়ে অনন্তকাল ধরে ওই একটা নির্লজ্জ নিষ্ঠুর, রসিকতা চলছে। চক্রবেড় রেল নিয়ে সমীক্ষা হবে, মুখ বাড়িয়ে এ-কথা যে বলতে আসবে, তার গালে ঠাস করে একটা চড় কষান। ওটাও ডাহা মিথ্যে, আপনার আমার জরুরী দরকার নিয়ে জুয়া আর জোচ্চুরি। সমীক্ষা, মানে সম্যক রূপে ঈক্ষণই শুধু। শুধু দেখা। দেখতে দেখতে চোখ যাবে। আকাশ-পাতাল, কোনও রেলই হবে না। নট নড়নচড়ন—নট কিচ্ছু নসিব নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করুন। ইংরাজীতে, যাকে বলে, 'স্ট্যু ইন ইয়োর ওন জুস্!'

বিশ্বাস করবেন না। যদি কেউ বলে, শহর থেকে রিক্শা শিগগিরই উঠে যাচ্ছে, মুচকে হাসুন। স্মাইল, প্লীজ! রিক্শা এ-সব দু'চার পুরুষের মধ্যে উঠছে না। ওঠানোর নাম করলেই "বিক্ষোভ" হবে, "চলবে না, চলবে না" আওয়াজের আড়ালে সব চলবে। রিক্শা, ঠেলা, গোরুর গাড়ি—সব। গোটা কতক শামুক, কচ্ছপ, কেঁচো ইত্যাদিও এই শহরে একবার চালিয়ে দিলে বরাবর চলত। এখানে কিচ্ছুই বদলায় না, খালি তলে তলে ক্ষয় হয়। (তবে কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর গলা নেই এই যা রক্ষে! আর ভোট নেই, যতদূর জানি। থাকলে চলত। যেমন চলছে চোরা চালানদার, রাস্তা-

ব্যারিকেড্-করা হকার, শরীরের পুঁজি বিকিয়ে আদি-ব্যবসায়, এমন-কী গ্রামেও জোত-জমিতে অলস ভাগ্যবানদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অনর্জিত মৌরসী অধিকার। অনর্জিত যত অধিকারের আবর্জনাই আজ আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে বড় পাপ, অর্থনীতির অভিশাপ।

*

মূল কথায় ফিরে আসি। রিক্‌শা-টিক্‌শা, তা-ছাড়া চলবে আপনাদেরই প্রয়োজনে। নইলে আপনারাই আরও অচল হবেন। দু' দিনের জলবৃদ্ধিতে কী হাল হয়, দেখলেন তো। জল-জঞ্জাল যা জমে, রিক্‌শা না থাকলে বিষম দুর্গতি, একেবারে অ-গতি।

মিছিমিছি গলা ভাঙছি। ভুলে গিয়েছি, আপনারা পরম-বিশ্বাসীও। ওই জল-জঞ্জালের ব্যাপারটাই উদাহরণ হিসাবে নিন না! ওগুলো জমে কেন? যদি জানতে চান, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পান—'অনেকদিন আগে নিকাশী নলগুলো মাটির তলায় পাতা হয়েছে, আমাদের শহরটা যে বড়ই পুরনো।' ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করলেন। একবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন না, এই ভুবনের পয়লা সারির শহরগুলোর কোন্‌টি কলকাতার চেয়ে কম পুরনো? লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, বার্লিন, এমন-কী অর্বাচীন ন্যু-ইয়র্ক? কোন্‌টি কম প্রাচীন? তবে। তবে, নাকের আগে নজর বাড়িয়ে, ওদের প্রত্যেকে আগে ভাগে ব্যবস্থার বদল করে যে-ভাবে অন্তত এই একটি সমস্যা মোটের উপরে এড়িয়ে গিয়েছে, কলকাতা তা পারেনি কেন?

কলকাতা আজ কথায় কথায় খঞ্জ হয়, তার কারণ তার কাণ্ডারীরা বরাবর অদূরদর্শী, অলস, অন্ধ। আর সহিষ্ণু বিশ্বাসপরায়ণ তার অধিবাসী। গা-গরম ভাবটা শুধু ওপর-ওপর। তলায় আসলে জ্বালা নেই, প্রতিবাদ নেই, নেই সুস্থতার জন্য সত্যিকার আগ্রহ। কথায় বলে, যে যা "ডিজার্ভ" করে, সে তাই পায়। আমরাও ডিজার্ভ করি এই অ-ব্যবস্থাই। আমরা সর্বতোভাবেই এই কুরূপা নগরীর নাগর হওয়ার যোগ্য।

আগের জের টেনে লেখাটা এইভাবে সাজাচ্ছি :

তিনি বললেন 'ছাত্রদের রাজনীতি করা অনুচিত।'

আমি বললুম, 'সর্বদেশে, সর্বকালে করেছে। আপনারাও এক কালে করিয়েছেন। আঙ্গুরফলগুলো নাগালের বাইরে গেল বলেই কি টক হয়ে গেল?'

তিনি বললেন, 'তা-ছাড়া শিক্ষককুলের একটা অংশ ওদের প্রভাবিত করছেন।'

বললুম 'চিরকাল করেছেন। তা-ছাড়া, এক-চোখ হরিণের মত আপনারা কেবল রাজনীতি-রাজনীতি করছেন। সমাজের দিকে চেয়ে দেখছেন না। সমস্যাটা মূলত সমাজের। দেখুন, প্রথমত শিক্ষার কলে একটা আজব পণ্য উৎপাদন, আর পরীক্ষার চালুনিতে সেটাকে ছেঁকে নেবার ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটা "বুরজোয়া" কিনা, ডিকশনারি না দেখে বলতে পারছি না, তবে একটা চালাকির ফলাও ব্যবসা। চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না, হচ্ছে না। বড় জোর কিছু-কিছু শিক্ষা-ব্যবসায়ীর ঐহিক সমস্যার সুরাহা হচ্ছে। তবে নিজেদের চালে নিজেরাও এরা মাঝে মাঝে মাৎ হতে বসেন। যথা, শিক্ষাক্ষেত্রে একটা "এক্স্প্লোশন" ঘটাতে গিয়ে এঁরা শুধু পরীক্ষার্থীর সংখ্যাতেই বিস্ফোরণ ঘটালেন, তুবড়ি ফেটে এখন কেবল কালি, ছাই আর তার টুকরো নিচে ছড়িয়ে পড়ছে।'

'প্রতি পঞ্চায়েতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিজ্ঞা অতি পবিত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা গেল, উপযুক্ত শিক্ষক দূরে থাক, উপযুক্ত উপাচার্যও মেলা ভার। রাজনীতিতেও যেমন রাষ্ট্রের ভার অযোগ্যদের হাতে সঁপে দিয়ে এখন পস্তাচ্ছি, শিক্ষার বেলাতেও তাই—,

কথার তোড়ে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, 'শিক্ষাব্রতীরা কি অযোগ্য ?'

বললুম, 'যোগ্যতার প্রশ্ন পরে। স্বেচ্ছায় অনেকেই আসেননি যে। বাধ্য হয়ে ব্রতধারী। জোর করে ব্রহ্মচারী বানালে যা হয়। খোঁজ নিয়ে দেখুন, একটা ভাল চান্স পেলে এঁদের ক'জন স্বর্ণডিম্বের পিছনে ছুটবেন, ক'জন তখনও ভাবী জাতি গঠনের মহৎ কর্মে লিপ্ত থাকতে প্রস্তুত? অস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে জমিদারদের দিয়ে সুফল মেলেনি। অস্থায়ী আমলাতন্ত্রের আমলেও যেমন, দেখা যাচ্ছে, এই রাজ্য রামরাজ্য হয়নি—থুড়ি, ফের সিলিপ্ করে রাজনীতিতে চলে যাচ্ছি।'

তিনিঃ 'শিক্ষকেরা শুধু কি বেতন কম বলেই—'

বললুমঃ 'মর্যাদাও কম। স্বাধীনতার পর একটা বড় রকমের ডিভ্যালুয়েশন ঘটে গেছে। আগে বেতনের ঘাটতি পুষিয়ে দিত শ্রদ্ধা। ভেবে দেখুন, সেকালের সমাজে এক-একজন শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষের কী প্রতিষ্ঠা। অনেকে তো ছিলেন যাকে বলে এক-একটি কিংবদন্তী-ব্যক্তিত্ব! মফস্বলে প্রশাসক, বিচারকদের চেয়েও বেশি সম্মান পেতেন। এখন, তাঁরাও দেখেন, স্থানীয় রাজনীতি-ব্যবসায়ী, অথবা কলেজের চৌকাট যে ডিঙোয়নি, সেই দল-উপপতিরও খাতির ঢের বেশি। মূল্যবোধের বিপর্যয়ে সে-ই বরং কুলীন। তখন সখেদে ভাবেন, জীবন বিফলে গেল, শেলি-কীটস, আইনস্টাইন-জীন্স্, মারক্স-কীন্স্—সকলেই ঠকাল। সাধারণ শিক্ষকও যখন দেখেন, হঠাৎ-নবাব ঠিকেদার বা আঙ্গুল-ফুলে কলাগাছ ব্যাপারী কিংবা মজুতদারের টেরেলিনের স্বচ্ছ পকেটে শ'য়ে শ'য়ে টাকার নোট্—। এঁদেরও অবশ্য বেতন বেড়েছে, কিন্তু মহাশয়, হতাশা বা ঈর্ষার মূলে তুলনাও সক্রিয় থাকে।'

যাঁকে বলছিলুম, তিনি নিজেও স্বচ্ছল, সুতরাং তাড়াতাড়ি পাতা ওলটানোর মত করে বললেন, "শিক্ষার কথা কী বলছিলেন ?"

না ভেবেই জবাব দিলুম, "শিরদাঁড়া-ভাঙা পাঠ্যক্রম। ইংরাজেরা একটা ছাঁচ ঢালাই করেছিল। তাতে কেরানী থেকে দরকারমত সুযোগ্য সিভিলিয়ান, সব প্রস্তুত হত। হঠাৎ এঁরা ঠিক করলেন এই সিস্টেম কমপ্লিট না—বাচ্চাদের ধরে ধরে ট্রিপল অ্যান্টিজেন ইনজেকসন দেবার মত, সব্বাইকে জ্ঞানবৃক্ষের প্রতিটি ফল ভেঙে ভেঙে একটি করে বীচি খাওয়াতে হবে। সেই সঙ্গে নতুন একটা কথা আমদানি হল, "বায়াস্"। অর্থাৎ, কাব্য পড়ে কিস্সু হয় না। ফিলজফিতে এম-এ পাশ করে কী হয়?—না ফিলজফিরই লেকচারার হয়। ব্যবহারিক জীবনে এ-সব বিশেষ কাজে লাগে না। সুতরাং 'এ চলবে না,' 'কারিগরি!' 'কারিগরি!!' মনমাতানো স্লোগান উঠল। ভোলা হল যে, কাব্য বা দর্শন কিছু না পারুক, মানুষকে আর-একটু মানুষ হবার আভাস-ইঙ্গিত দেয়।"

"যাই হোক, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার অপরিকল্পিত পরিবারে নবজাত শিশু-কারিগরেরা দেখছেন, বড় বড় কীর্তিস্তম্ভ, নির্মাণ-টির্মাণ তো দূরের কথা, হাতে একটা বাটালি ধরার সুযোগও কেউ পাবেন না।"

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, এমনই একটি সমাজ, যেখানে সক্ষম, ইচ্ছুক যুবসম্প্রদায় জানে, তার কোনও ভূমিকা নেই। ছাত্ররা জানেন, তাঁরা পাহাড়-প্রমাণ এই পাঠ্যক্রমের কৃপায়--পড়লেও পাশ করবেন না, পাশ করলেও পাবেন না কাজ। কাজ পেলেও, কল্পনায় যে-স্বাচ্ছন্দ্য আর মর্যাদার ছবি আছে, তার সঙ্গে সেটা মিলবে না। শিক্ষকদের দেখেছি। আবার ছাত্রদের পিছে-পিছে এসেও সেই একই বিন্দুতে পৌঁছে যাচ্ছি: হতাশা। হতাশা আনে বিদ্বেষ, বিরূপতা। 'আমাকে দিয়ে যে-সমাজের কাজ নেই, সেই সমাজকেও চাই না আমরা'—এই শূন্য-পুরাণ।'

সন্দিগ্ধ গলায় তিনি বললেন, 'সমাজ না-হয় এদের কাছে অর্থহীন হয়ে গেল, কিন্তু পরিবার?"

বললুম, 'এইবার পথে আসুন—পরিবার। শিক্ষকেরা না-হয় ঠিক শিক্ষা দিচ্ছেন না, কিন্তু অভিভাবক? এই ছাত্রদেরও তো মাতা-পিতা-ভাই-বোন, গোত্র-পরিবার সব আছে? তারা কোথায়? যে-বিশৃঙ্খলায় আমরা শিহরিত হই, তাকে রাশ টেনে ধরে রাখবে, এমন দৃশ্য কি অদৃশ্য প্রভাব কি কোথাও নেই? মা তো জানেন, ছেলে কখন বাড়ি ফিরল, বাবা নিশ্চয়ই টের পান, সে মিছিলে গিয়েছিল কি না!'

'জেনেও যদি চুপ করে থাকেন, তবে একটা কারণ ধরে নিতে হবে, ঔদাসীন্য। দুই, প্রভাবের অভাব। তিন সমর্থন। তার মানে মুখ ফুটে বলুন বা না বলুন, ছেলেদের কাজে, তাঁদেরও সায় আছে। নইলে এতদূর গড়াত না।'

'প্রথম—ঔদাসীন্য। আমাদের অনেকেরই "সুইট্ হোম্" মিষ্টত্বে না হলেও, এক-একটি মৌচাক। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা-আলাদা চাক। যে-যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, আত্ম-ইষ্টে সচেষ্ট, আপন-আপন সমস্যায় বিব্রত। সস্তা স্বার্থ নামক আঁটসাঁট ছোট্ট জুতোর মধ্যে পা গলিয়েছে। কে কার খবর নেবে।'

'এটা গেল একটা দিক। দ্বিতীয়, বলেছি, প্রভাবের অভাব। প্রভাব বিস্তার করতে পারে ব্যক্তিত্ব, শ্রদ্ধা আর স্নেহ। ও-সব রেশনের চিনির চেয়েও কমে যাচ্ছে। গুরুজনগণ যখন দিনান্তে, একটিমাত্র ঘরে আলাপরত, তখন কখনও কি ধমক দিয়ে বলেন না, "খোকা, গোল কোর না, বাইরে যাও?" খোকা, ক্ষুব্ধ, বাইরে যায়। কিংবা গুরুজনদের মধ্যে যখন বিশ্রী কথা কাটাকাটি, খোকা দেখে, সে একটি প্রক্ষিপ্ত চরিত্র। দাঁতে দাঁত চেপে খোকা তখনও বাইরে যায়। যায় গলিতে। গলিতে অন্য জীবন খোঁজে। তার অন্তরঙ্গ হতে পারে, এমন জীবন।'

'এই ঘরের শূন্যতা, স্নেহহীনতার কথাই বলছি। শুধু খোকাদের কেন, বড়দেরও কি একই যন্ত্রণা নয়? আপনারা শুধু মিছিলটাই

দেখেন। মিছিল যখন নেই, তখনও কি দেখেননি, লোকে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়েছে দলে দলে ? কোথাও যেতে নয়, কিছু কিনতে নয়— এমনিই নিরুদ্দেশ্য ভাবে। সন্ধ্যায় রাশি রাশি শুকনো পাতার মত হাওয়ায় ভাসছে। "অতল জলের আহ্বান ?" ওটা কাব্যিক, কিন্তু খাঁটি কথা এইটে যে, "মন রয়না ঘরে।" ঘরে কিছু নেই তাই বাইরে আসে। বাইরেও কি কিছু মেলে ?'

দিব্যি ভাবাবেগ এসেছিল, তাঁকে বলে গেলাম 'দেখুন, রাজনীতি নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে এই সমাজের শূন্যতার দিকে তাকান। ভেবে দেখুন, একসঙ্গে সব বেঁধে রাখার যেটা মৌলিক উপাদান— ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ; ভালবাসা জীবনের প্রতি— সেই আঠার শিশিটা উধাও হয়ে গেছে কিনা।'

'ছাত্রদের নিয়ে আমি খুব বেশি ভাবি না। তাঁদের বয়স আছে, সময় আছে। আপনা থেকেই এদের অনেকে হয়ত আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসবে। কিন্তু যাঁদের বয়স গেছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী, সবকিছুর প্রতি প্রবল ফুৎকারের ব্যাখ্যা কী ?'

একটা মিছিল বেরিয়েছিল, শোনা যাচ্ছিল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'চলবে না চলবে না।' সেদিকে বাঁকা চোখে চেয়ে তিনি বাঁকা হেসে বললেন, "ভুল উদ্দেশ্য, ভ্রান্ত উত্তেজনা।"

বললুম 'আদর্শ ভুল হতে পারে, কিন্তু এই উত্তেজনা ? এটা তো জলজ্যান্ত এবং খাঁটি। দেখুন, এই সমাজ-ব্যবস্থায় আমার ব্যক্তিগত স্টক বিশেষ কিছু নেই। আপনি তো জানেন, আমার নিজস্ব সঞ্চয় এক-রকম নেই, এখনও সম্ভ্রান্ত ভাড়াটে মধ্যবিত্ত নাগরিক, আমিও শ্রম, বুদ্ধি, স্কিল্, এইসব বিক্রয় করি। তবু মিছিল দেখলে বিচলিত হই কেন, নিজেকে এই কথা জিজ্ঞসা করেছি। উত্তর পেয়েছি, এই সমাজ-ব্যবস্থায় আমার ফিক্সড্ ডিপোজিট না-ই বা থাকল, একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হয়ত খুলেছি। খরিদ করেছি একটি সিকিওরিটির সার্টিফিকেট। তাই আজ হৈ-চৈ হতে দেখলে ভয় পাই। নিরাপত্তার

বাগিচাটি (এ-ও ছোট, ফুল-টুল বিশেষ নেই) পাছে তচনচ হয়ে যায়, সেই ভয়।'

'সেই ভয় কি এঁদের নেই ?'

'সেটাই তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করি। এঁদেরও তো অনেকে যেমন-হোক, তেমন-হোক, কিছু-না-কিছু কাজ নিয়ে আছেন। ভয় কি এঁদের নেই—অফিস "বস্"কে চটাবার ভয়, চাকরি যাবার ভয়। আন্দোলন মানে তো বিপর্যয়েয় ঝুঁকি ? তবে কি জীবনের কাছে আমি সাবধানী, যেটুকু বাঁধা আছি, এঁরা তা-ও নেই ? আমি যা পেয়েছি, এঁরা কি তা-ও পাননি ?'

'আপনি বলবেন উত্তেজনা। কিন্তু কোন্ উত্তেজনা বৃত্তিজীবী, চাকুরিজীবী বয়স্ক নাগরিকদেরও সব হিসাব ওলট-পালট করে দেয়, কোন্ প্রতিবাদ আর ঘৃণা থেকে এঁরা জয় করেছেন সকল ভয় ?'

ক্লান্তস্বরে বললুম, 'দেখুন, উন্মাদনা বলে উড়িয়ে দিতে চান, দিন। কিন্তু এর তীব্রতাকে অস্বীকার করবেন না। বরং চেয়ে দেখুন, কোন্ শুষ্কতা, শূন্যতার উপরে আছি। যে-শূন্যতা মে-মাসের দ্বিপ্রহরেও দলে দলে মানুষকে বাইরে টেনে আনতে পারে ! এই অসহ্য গ্রীষ্মেও এঁরা মাইলের পর মাইল হাঁটছেন—ভ্রান্ত বলুন, যা-ই বলুন—এই মরীয়া ভঙ্গি, এই হাঁটাটা তো মিথ্যে নয়।'

তিনি জানলাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে বললুম, "খোলা রাখুন। অচিরে ইলেকসন নামক যে-চিত্রটি মুক্তি পাবে, তার অ্যাডভান্স বুকিং, সীটের ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপনী-প্রচার, সব শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সামাজিক কন্‌টেণ্ট না থাকলে রাজনৈতিক নাটকটি আবার ফ্লপ্ করবে, বুঝছেন না ? সেই জন্যেই সমাজের চেহারাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতে বলছি। জানালাটা বন্ধ করবেন না।"

ফেরারী ফের হাজির।

জেরা করবেন না কেটে পড়েছিলুম কেন। একটা বাজে অজুহাত দেব। কারণ দর্শাব বর্ধা। তার চেয়ে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক। সোজাসুজি কিছু লেখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিজের গলা ভাঙা যায়, পরের কিছুমাত্র হৃদ্-বদল হয় কি। যাঁকে খোঁচা দেব তিনি চটবেন, যাঁকে সুড়সুড়ি তিনি আমোদ পাবেন, ব্যস। এর বেশি কিচ্ছু না।

তা-ছাড়া ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। এদেশ বিপ্লবের জন্যে তলে তলে তৈরী হচ্ছে কে বলে। আমি তো এক হিসেবে চতুর্দিকে দেখি সর্বংসহ ধরিত্রীর প্রতিমূর্তি, রোষে-ক্ষোভে কি ঘৃণায়-বেদনায় যা কিছুতেই বিদীর্ণ হয় না।

কয়েক সপ্তাহ আগে খোলা ওয়াগনে জলে-ভেজা খাদ্য-শস্যের কথা মনে পড়ছে? কাগজে ছবি ছাপা হয়েছিল। আমাদের কারও গা রী-রী করল, অম্ল-মধুর টীকা-টিপ্পনি বেরুল, তোতলা কৈফিয়ত দু' একটা, প্রেস নোট, বিবৃতি—অতঃপর সব ঠাণ্ডা। গণতন্ত্রী বা স্বৈরতন্ত্রী অন্য যে-কোন দেশে, যেখানে জনমত জাগ্রত, এমন কাণ্ড ঘটলে কত মুণ্ড না জানি গড়াগড়ি যেত—হেডস্ উড্ হ্যাভ রোল্ড। দায়ী যারা আর যারা দোষী, তারা পত্রপাঠ বরখাস্ত হত। যেহেতু জনস্বার্থকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কেউ কোথাও এক দণ্ড তিষ্ঠোতে পারে না —যে-জমানা বা মুলুকে সরাসরি জবাবদিহির ঠাট নেই, সেখানেও। আমলাতন্ত্রের ইম্পীচমেন্টের পক্ষে ওই একটি ঘটনাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু কোতল হওয়া দূরে থাক, কাউকে কাঠগড়াতেও দাঁড়াতে হয়নি। বে-দরদ বে-শরম অপদার্থের দল মানুষের মুখের গ্রাস পচিয়ে বেকসুর

খালাস পেয়ে গেল কিনা সেই দেশে, যে ব্রহ্মচারী ব্রতধারী দেশ মুখে 'ভবতি। ভিক্ষাং দেহি' এই মন্ত্র নিয়ে ফী-বছর ত্রিভুবন পরিক্রমা করে।

নিরঙ্কুশ, নির্বিকার নির্লজ্জতার এমন নমুনা কুত্রাপি মিলবে না। এমন ক্ষমা এমন সহিষ্ণুতারও না।

তার কারণ এ-দেশে জনমত আসলে কুম্ভকর্ণ। তার নাক-ডাকার আওয়াজকে মাঝে-মাঝে যদিচ জাগরণের লক্ষণ বলে ভ্রম করি। সেই সেকালে স্বামী-স্ত্রীতে যেমন দেখা-সাক্ষাৎ হত স্রেফ একবার, নিশুতি রাতে, একালে এদেশেও জনগণের সঙ্গে প্রশাসনের মোকাবিলা হয় পাঁচ বছরে একবারই মোটে—সম্পর্ক শুধু ভোটের। সেকালের সতী-লক্ষ্মীদের অধিকার বলতে ছিল একটাই—শয্যাসঙ্গী হবার। এই রাষ্ট্রেও জনগণের একটাই অধিকার—ভোট দেবার। কে বলে সে অস্থিরা বা মুখরা? সে অত্যন্তই বিশ্বাসপরায়ণা ও সুশীলা। নতুবা যে-পতি বার বার বিশ্বাসঘাতী, সেই ব্যবস্থার কাছে কি বার বার নিজেকে অকাতরে সঁপে দেয়? এই নালিশহীন, গ্লানিহীন সহ্যশক্তি, এই সর্বত-আত্মসমর্পণের তথাকথিত সতীত্বকেই ধিক্কার দিচ্ছি।

ভাষাটা চাঁচা-ছোলা হয়ে যাচ্ছে? নাচার। ক্ষমতা থাকলে কলমটায় কালির বদলে ভরে নিতুম বিষ, জিভ্‌টাকে করতুম সাপের শিস। কারণ আমি নৈরাশ্যের হাওয়ায় কল্‌জে ভরপুর করে নিয়েছি। বিশেষ কোনও পার্টি সম্পর্কে আমার তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা নেই। কেউ রাম নয়, রাবণও কেউ না। সদা দূরে থাক, কদাপি সত্য কথা কেউ কন না। তবু চরাচর যখন ডুবু-ডুবু, তখন প্রলয়ের জলে চিতপাত কেশবদের হাতে নির্বাচনী বেদখানি খালি উঁচু করে ধরা আছে।

রোজকার দরকারী জিনিসের মধ্যে তৈল তণ্ডুল ইন্ধনের ঘাটতি, সেটা আলবৎ ভাববার বিষয়। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি ত্রিবিধ বৃত্তি লোপাট। পার্ক ষ্ট্রীটের চেয়েও রোম-হর্ষক এই ডাকাতি কবে ঘটে গেল?

দেখুন, বড় বড় তত্ত্বমূলক বুকনি ঝেড়ে, বিচ্যুতি কোথায় তা নিয়ে পাড়া মাথায় করা আমার ধাতে নেই। আমি ছোটখাটো ব্যাপার দেখি, যা বোঝবার তা বুঝি। বছর কয়েক আগে সালকের রাস্তায় একবার গিয়ে (তখন কংগ্রেস সরকার) অন্নপ্রাশনের ভাত যখন বেরিয়ে এল, আর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত হাড় ক'খানা প্রায় যায়-যায়, তখনই মনে হয়েছিল, শুধু এই কলঙ্ক আর বছরের পর বছর একটি রৌরব নরক জীইয়ে রাখার লজ্জায়, যে-কোন গবরনমেণ্ট, যদি তার চোখের পরদা থাকত, পদত্যাগ করত। গত বছর (যুক্ত ফ্রণ্টের আমল) ওই এলাকায় গিয়ে দেখি একই হাল। আর এ-বছরে তো দিন কয়েক কয়েক পশলা জোর বৃষ্টির পরে গোটা রাজ্য, বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল-সহ সারা কলকাতা ও হাওড়াই সালকে হয়ে গেল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেলগাছিয়া-টালা বা হালতু-বেহালা বা সব শহরতলিরই লক্ষ লক্ষ মানুষ জলে-কাদায়, কুৎসিত বীভৎসতায় যে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন, একটি অগ্ন্যুৎপাতের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট।

হায়, তরোরিব সহিষ্ণু মহানগরী, আর তার মহানাগরিক—কোন-প্রকার উৎপাতই ঘটেনি। পৃথিবীর আর কোন্ দেশে বিমানঘাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী শহরে পরিবহিত হন বাস-এ? তারপরও লম্ফ-ঝম্ফই সার—কেৎলি আর হাঁড়ির কালামুখ চিৎকার। নীরোরা তখনও নির্বাচনী বাঁশি বাজিয়েছেন, আর করেছেন কী?

হাজিরাখাতা নিয়ে নাম ডাকুন। খবর নিন জল আর জঞ্জাল নিয়ে যখন পয়লা নম্বর স্ক্যানডাল, তখন মাননীয় মেয়র মহোদয় কতদিন ছিলেন স্বদেশে, কতদিন বিদেশে। আর কোন্ কোন্ কাণ্ডারী পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করে জমিয়েছেন পাড়ি। স্বয়ং রাজ্যপালই বা কতদিন ছিলেন কলকাতায়, কতদিন দার্জিলিং-য়ে, অথবা বিবিধ যোজনাব্রতের আহ্বানে দিল্লীতে?

যেমন আমাদের গণতন্ত্র, তেমনই আমাদের আমলাতন্ত্র। এর মধ্যে পৌরতন্ত্র আবার রাজনীতিতে হাতে-খড়ির কিণ্ডারগারটেন—

ঘরের মধ্যে ঘর যেমন মশারি, গণতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্র তেমনই ওই লালবাড়ি। ওর অঙ্গে হাত তোলে, সাধ্য কার! হস্তক্ষেপের কথা উঠলেই গণতন্ত্রের শ্লীলতাহানি হল বলে হাহাকার।

আমরা এমনই অন্ধ। যতদিন স্ব-শাসন ছিল না, ততদিন ওই দুধের বদলে ঘোল, পৌর স্বায়ত্তশাসনের স্বাদের মূল্য ছিল। আজ কপালগুণে গণতন্ত্র একটি গোদ হয়ে উঠেছে, আর পৌরতন্ত্র তার উপরে এক বিষফোড়া।

কিছু করে না, করার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে যদি-বা থাকে, তবে সাধ্য নেই। বহু ট্যাক্সো অনাদায়ী, সব যদি আদায়-উশুলও হত, তবু কুলোত না। প্রায় প্রতিটি পৌরসভার আয়ের বারো-চোদ্দ আনা পৌরসভার ঠাট বজায় রাখতেই খরচ হয়ে যায়।

এক কথায়, পুরীগুলির কল্যাণের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, ওগুলো আসলে হয়ে দাঁড়িয়েছে এক-একটি কর্ম-সংস্থান কেন্দ্র, কর্মী-পোষণের আশ্রম। বেকার-সমস্যা ঘোচাতে এগুলোর ভূমিকাও কম না, এই পর্যন্ত স্বীকার করি। কিন্তু পাণ্ডা-পুরোহিতদের পাওনা মিটিয়ে পূজার্চনা, ফুল-বেলপাতার খরচটুকুও বাঁচবে না? তবে কিসের জন্য মন্দির?

এসব অসমীচীন ছোট প্রশ্ন আমরা মুখেও আনি না। পরের ভাবনার ভূত এমন পরাক্রান্তভাবে ঘাড়ে চেপে আছে যে ঘরের দিকে তাকাই কখন। পাকিস্তান, চীন, রুশ-মার্কিন, চেক-ভিয়েতনাম—দুনিয়ার তাবৎ সমস্যার ফয়সালা করে ফেলতে হবে না? সুতরাং গাল ফুলিয়ে বিক্ষোভ জানাই—র‍্যালির পর র‍্যালি ডেকে আকাশ ফাটাই।

বিপ্লবের যত বুলি বাতকাওয়াস্তে, আসলে একটি জাতি, স্থির শীতল অপমৃত্যুর অপেক্ষা করছে। নতুবা এই বেকায়দার প্রশ্নটা জনগণের তরফ থেকে সরকারের কাছে কেউ না কেউ তুলে ধরতই যে, পৌরসভা না হয় অপদার্থ, অক্ষম, কিন্তু আপনারা করছেন কী?

রাজ্য সরকারও যদি না পারেন, তবে কেন্দ্র? কলকাতার দায় কি কেন্দ্রেরও নয়? টাকার যদি অকুলান থাকে, তবে বিপজ্জনক আরও একটি বক্তব্য—কী কাজে লাগছে আমাদের সৈন্য-সামন্ত, বিপুল পীসটাইম আর্মি? পৌর সমস্যার সুরাহায় এদের কাজে লাগানো যায় না? শ্রবণমাত্র শিহরিত বহু শরীর জিভ্ কেটে কানে আঙুল দেবে। সর্বনাশ, বলে কী। দেশরক্ষার ভার এই বাহিনী বহন করছে না?

বটেই তো, বটেই তো। তবে, ভয়ে কব কি নির্ভয়ে?—একটা কথা। দেশরক্ষার ডাক আজই তো আসেনি। হয়ত আসবে আগামী কাল কি পরশু। তার আগে খুচরো কিছু কাজ করিয়ে নিলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হবে?

দেশ আগে বাঁচুক, তবে তো তাকে রক্ষা! মরাকে কে-বা রক্ষা করে?

*　　　*　　　*

মহামান্য সরকার-বাহাতুর, জানি আপনাদের অর্থের টানাটানি। মাথায় টানতে গায়ে কুলোয় না। যিনিই ক্ষমতায় আসুন, এক সঙ্গে সবসমস্যার এসপার-ওসপার করা ক্ষমতায় কুলোবে না। তা-হলে বড়-বড় ম্যানিফেস্টো আর দফা-দফা কর্মসূচীতে কাজ কী। ছোট-ছোট সূচীতে সুতো পরান না। ধরুন, ঠিক করলেন প্রথম বছর আপনারা প্রতিজ্ঞা করলেন, 'এই বৎসর আমরা মৎস্য-সমস্যা মেটাব।' দ্বিতীয় বৎসরে ধরলেন ত্বধ। তৃতীয় বৎসরে হাতে নিলেন রাস্তার ব্যবস্থা। এই ভাবে 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা'র পাঁচসালা সংকল্প অনায়াসেই স্থির করা যায়। ছোট-ছোট প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা সহজ ও সম্ভব—এ তো আর খাদ্য, শিক্ষা, শিল্পায়ন, প্রতিরক্ষার মত এলাহি কাণ্ড-কারখানা নয়।

*　　　*　　　*

জানি, এতসব ছোট্ট কথা কেউ কানেও তুলবেন না। বড় বড় আস্ফালনই আমাদের সম্বল। এত জপ-তপ তন্ত্র-মন্ত্র সাধ করে কেউ বিসর্জন দেয়। উচ্চারণ আরও উচ্চকণ্ঠ হবে। সেই সঙ্গে কাড়া নাকাড়া বাজবে। কেউ বলবেন, 'ভোট? এখনই হোক।' কেউ ভাল রাস্তাঘাট নেই বলে ছ'চার দিন পিছিয়ে দিতে চাইবেন।

যাঁরা বলবেন, 'এখনই হোক', তাঁরা সদ্ভাবে থাকার না হোক, অন্তত পরেও এক জোট থাকার মুচলেকা দেবেন কি?

হলপ করে কেউ কি বলবেন যে আসানসোলের সমাজতন্ত্রী ইনি ভবিষ্যতে বাম-তার কোন শরিকের "অত্যাচারে আর তো পারি 'না" বলে আর্তনাদ করবেন না। সহকর্মীদের না জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সীমান্ত-অঞ্চলে চালু করবেন না কেন্দ্রীয় আর্মস অ্যাক্ট। এক জনের পে-কমিটির সিদ্ধান্ত আর-একজন নাকচ করবেন না ভিটো প্রয়োগ করে। এই সব এবং আরও অজস্র বিরোধ, রেষারেষি আর খেয়োখেয়ির আরও বিস্তর নজির আছে। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ঘটেছে অনেক পরে। এ-সমস্তই সাম্প্রতিক ইতিহাস।

আবার অপর পক্ষ পারেন যদি বিয়ের লগ্ন পিছিয়ে দিন, কিন্তু তার আগে দিন এই জবাবদিহি—বিশ বছর পরে একটা স্বাধীন দেশে নভেম্বরেও কেন রাস্তাঘাট জলমগ্ন থাকে? এখনও বড় বড় কয়েকটি নদীতে সেতু নেই কেন—সে কি কোন-কোন ইজারাদারের স্বার্থে?

তারও আগে দিতে হবে, দলত্যাগ ঘটবে না এই গ্যারান্টি। কথা দিতে হবে, যদি পরাজয় ঘটে, তবে তাঁরা বিরোধী পক্ষের ভূমিকা নিয়েই তৃপ্ত থাকবেন, কোন মাইনরিটি মিনিস্ট্রির পিছনে ভৌতিক ছায়া বিস্তার করে তাকে 'উমদা চীজ-গণতন্ত্র' বলে চালাবেন না।

আর যদি জয়মাল্য গলায় পড়ে, তবে অন্তত এইবার বাস্তব এবং গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করবেন। তান্ত্রিকতার জগাখিচুড়ি আর চাপাবেন না। চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। যদি ট্রাম কোম্পানি গলায়

কাঁটার মত বিঁধে থাকে, তবে বিজলী কোম্পানি গেলার জন্য হাঁ-টাকে আরও বড় করবেন না। পাবলিকের টাকায় সেকটরের পরে সেকটর —ওতে পাবলিকেরই পকেট মার যায়। লোকসানের ব্যবসার পর ব্যবসা খোলার নাম কি সমাজতন্ত্র? স্টেট ক্যাপিটালিজমও সমাজতন্ত্র নয়। চৌদ্দ ক্যারাট, বা গিল্টি মাত্র। খাঁটি গিনি যদি হত, তবে তো বলতে হয় আমাদের ব্রিটিশ প্রভুরাই ছিল সমাজতান্ত্রিক হিসাবে নৈকষ্য—কারণ রেল কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত তারাই করেছিল।

* * *

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এখনও যদি ফিরে না আসে, তবে হালে বসার জন্যে যখন কাড়াকাড়ি, তখন ফুটো নৌকোটি ধীরে ধীরে ডুববে। কুলটির ধস তো একটা প্রতীকী সঙ্কেত। কলকাতার মনের কথাটা ওঁদের কেউ কি কোন দিন কান পেতে শোনেন নি? কলঙ্কপঙ্কে নিমজ্জিত, উপেক্ষায়-অপমানে বিপন্ন সীতা-কলকাতা আজ মৃদু-স্বরে বলছে, "ধরিত্রী দ্বিধা হও, আমি পাতালে প্রবেশ করি।"

একুশ
এবং সাবালক

তখন, যতদূর মনে পড়ছে, আমরা জড়ো হতাম একটা খোলা মাঠে। সকাল হতে না হতেই, দলে দলে। ত্রিবর্ণ পতাকা উঠে গেছে উপরে, হাওয়ায় নীলে ভাসছে, নীচে আমরা সকলে কাঁধে মিলিয়েছি কাঁধ, গলায় গলা: "বলো বলো বলো সবে"। গান। সংকল্পবাক্য পাঠ করেছি "আমরা বিশ্বাস করি···।"

সেই ত্রিশ-বত্রিশ সালে। তখন স্বাধীনতা-দিবস ছিল শীতকালে। আমাদের বাল্যে।

কী বিশ্বাস করতাম, তখন? বিশেষ কিছু না। শুধু বলতাম। বলতে বলতে একটা অর্থ দাঁড়িয়ে যেত। ত্রিশ কোটি মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেঁধে রাখার নৈতিক অধিকার ইংরাজ প্রভুদের নেই। আরও পরে ঐতিহাসিক নজিরগুলো মুখস্থ করেছি। ধ্যান করেছি দেশ-বিদেশে শৃঙ্খল-মুক্তি-কথার অধ্যায়ের পর অধ্যায়। উদ্যতমুষ্টি, বক্ষে—সাহস চক্ষে—দীপ্তি সংগ্রামী মানুষগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছি। আয়রল্যাণ্ড, ইতালী, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া—হ্যাঁ রুশ বিপ্লব পর্যন্ত। মুক্তিসংগ্রাম আর বিপ্লব, বিচারে বা অনুভবে তখন একাকার। দুই-য়েরই মূল কথা—স্বাধীনতা।

বিলিতি কাপড় আর গাঁজা ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের দোকানে পিকেটিং, লুকিয়ে বাজেয়াপ্ত বই পড়া, নিরামিষ আইন-অমান্য (লবণ-বিক্রী, পরীক্ষা বয়কট, মিছিল) আর গোপনে, লাঠি আর ছোরা খেলা শেখা, সব একসঙ্গে চলত। কোনও দাদা বিশ্বাস করে কোন ছেলেকে খড়ের গাদায় রিভলভার লুকিয়ে রাখতে দিলেন যদি, তার তো বুকের ছাতি দশ হাত হয়ে গেল।

উচ্চ মঞ্চে উচ্চতর টেবিলে চড়ে বহুসভায় কম্বুকণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলাম। বাবা ছিলেন ঘোর স্বদেশী, সেই জন্যেই ছেলেবেলায় ছিল নিদারুণ টানাটানি, সুখের মুখ একরকম দেখতেই পাইনি। আমি, ভালো ছাত্র, শুধুই ভলান্টিয়ার।

সেদিন শ্লোগান ছিল কী? সব মনে পড়ছে না। একটা ছিল "আপ্ আপ্ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, ডাউন ডাউন ইউনিয়ন জ্যাক।" (ঝাণ্ডা উঁচা রহে হমারা; তা-হলেই সব ঠাণ্ডা।)

ধ্বনি কিন্তু ছিল একটাই: "বন্দে মাতরম্"। আজকাল যেটা বিশেষ আর শুনি না। এবারের লেখাটা এ-পর্যন্ত লিখেছি স্মৃতি আর ভাবাবেগ মিলিয়ে, এবার সোজাসুজি প্রথম এই কথাটা বলছি: "জয় হিন্দ্" কখনও "বন্দে মাতরম্"-এর বিকল্প হতে পারে না।

"জয় হিন্দ্"-ধ্বনি সুভাষ-উদ্ভাবিত, এবং নেহরু-কর্তৃক দত্তক হিসাবে গৃহীত জেনেও এ-কথা বলছি। প্রথমত "হিন্দ্" কথাটা যে ভারতের নামান্তর, এটা আমাদের, বিশেষ করে বাঙালীদের, জ্ঞানে যদি-বা থাকে বোধে নেই। দ্বিতীয়ত, "জয়" শব্দটি মুখে আনলে একটি অহংকৃত কামনা সোচ্চার হয় মাত্র, বন্দনায় অবনত নিরহংকার পবিত্রতার ভাব এতে নেই। "বন্দে মাতরম্" একটি তরঙ্গিত ছন্দ, এবং ধ্রুবপদী; "জয় হিন্দ্" চটুল চটপট; গলা যদি-বা ভরে, বুক ভরে না।

সুতরাং সোজাসুজি বলছি, স্বাধীনতার ভোরে আমাদের প্রথম ভুল, ধ্বনি হিসাবে "জয় হিন্দ্" নির্বাচন।

*

নিবিড় কুয়াসা আর নিরাশার মধ্যে আমাদের স্বাধীনতার ভোর। ভোর মাত্রেই হয় রক্তাক্ত, নয় তো সজল—ভারতের কপালে দুই-ই ঘটেছিল।

তবু প্রথম স্বাধীনতা-দিবসের কথা আর অভিজ্ঞতাকে আমার স্মৃতি মথিত করে যেদিনই উদ্ধার করি, সেদিনই হর্ষ আর রোমাঞ্চের

কাঁটাগুলি ফিরে পাই, সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হই বিশাল একটি বিষাদে। গলায় যেন ডেলা উঠে আসে।

সেদিন অঙ্গবিচ্ছেদের বেদনা আর আঘাত ছিল, আবার সেই সঙ্গে ছিল এই ভরসাও—ঠিকমত শুশ্রূষা হলে জাতি হিসাবে ভারত নীরোগ হবেই হবে।

(জাতীয় ধ্বনি নির্বাচনের পরে আমাদের তুই নম্বর ভুল কি নামকরণ, ইণ্ডিয়া ছ্যাট্ ইজ ভারত ? ঠিক বলতে পারি না। হিন্দুস্থান বললে কী অশুদ্ধ হত ? ওই শব্দটিতে সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা আছে, এই ভ্রান্ত ধারণা কার ? মোগল বাদশাহরা এই নামই উল্লেখ করতেন এ-দেশের ; ইকবাল তাঁর উদ্দীপক সঙ্গীতটিতেও ব্যবহার করেছেন এই নাম। মুসলিম-মানসেও অতএব হিন্দুস্থান অভিধাটি স্বীকৃত ছিল। ভারত কথাটি কেতাবী আর পুঁথিগত। যাতুঘরের তাকে রাখা মূর্তিটি যতই সুন্দর হোক, তুলে এনে তাকে মন্দিরে কেউ প্রতিষ্ঠা করে না। করলেও তাতে সঞ্চারিত হয় না প্রাণ। অবন্তী, বিদিশা, সৌরাষ্ট্র, মালব—সেদিন অবাস্তব আবেগে, পুনরুজ্জীবনের মোহে, এক-একটি অঞ্চলকে এমন কত নামেই তো ডাকা হয়েছিল, একটাও টিকল কি ? পোশাকী নাম তু'দিনে ঘুচে গিয়ে ডাকনামগুলিই ফিরে এল।

তা-ছাড়া সেদিনের কাণ্ডারীরা ভেবেছিলেন কী ? নাম থেকে হিন্দুত্ব ঘুচিয়ে দিলেই দেশের অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে ? ধন্য কুহকিনী আশা! এ-আশা অলীক না হলে বিহার, জব্বলপুর, মীরাট, আবার বিহার—হানাহানির চক্রবৃত্ত বারবার আবৃত্ত হ'ত না।)

*

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭। স্বাধীনতা প্রত্যূষের পূর্বেকার রাত্রি। সেদিন যাঁরা যুবা ছিলেন আজ তাঁরা প্রৌঢ়। সেদিন যাঁরা সদ্যোজাত,

আজ যুবা তাঁরা। তাঁদের কিছু মনে নেই। প্রৌঢ়দের আছে। সেই রাত্রে মুর্গিহাটায়, নাখোদা মসজিদের এধারে ওধারে, সেই সরবত বিলি, সেই হিন্দু-মুসলমান কোলাকুলি? এ-আজাদী সেদিন সত্যিই, অন্তত আমাদের তো, মিথ্যে মনে হয়নি। দু'শো বছরের বাঁধন কেটেছে, বাঁধ ভেঙেছে, মুক্তধারার স্রোতে সব গ্লানি সব পাপ ধুয়ে যাচ্ছে।

তারপর? সব কি বিফলে গেল? যদি গিয়ে থাকে তবে তার জন্যে দায়ী জনতা নয়, সব ভুলে সে তো তৈরীই হয়েছিল, স্লেটের পুরনো আঁকিবুকি মুছে নতুন লেখা পড়বে, এই আশা সবে স্ফুরিত হচ্ছিল, তবু। তবু এবং তবু। দায়ী একা পাকিস্তানের নীতি আর আচরণও নয়—সমভাবে দায়ী আমাদের নেতৃত্ব। যা কাগজী প্রতিজ্ঞার আড়ম্বরের আড়ালে বিভেদকেই কখনও জেনে কখনও না জেনে আস্কারা দিয়েছে। যা গেল তা তো গেলই; যা রইল তাকে জড়ো করে একতার সমসূত্রে গ্রথিত করা হবে কোথায়, বোধের সমানতত্ত্বে; বৈষয়িক সুবিচার ও সুবিধায়; সামাজিক বিন্যাসে; আচারে, বেশ-ভূষায়, নামকরণে কোথায় একটা সর্বত-সত্য এক-জাতিত্বের ভিত্তি স্থাপন করা হবে, তা-নয়, সবই তেমনই ফেলে রাখা হল আলাদা আলাদা, যেন ডাকঘরের চিঠির খোপে-খোপে, কোনও ফাটল বোঁজাতে পলেস্তারা পড়েনি, যদিও মুখে সংহতির মন্ত্রপাঠ চলেছে; আর—আরও অসংখ্য ফাটল দেখা দিয়েছে।

আজও মুসলিম ভোট পেতে হলে দোয়া নিতে হয় মোল্লা বা পীরসাহেবদের; আবেদন জানাবার ওকালতনামা দিতে হয় মুসলিম নেতাকে। এমন-কী মুসলমান প্রধান কেন্দ্রে অমুসলমান প্রার্থীর সাফল্যের আশা দুরাশা জেনে মুসলমান প্রার্থীই দাঁড় করানো হয়ে থাকে। এ-ব্যাপারে সব দলের হাতই সমান কলঙ্কিত। মুখে যাই হোক ব্যবহারে বিরোধ নেই।

এক পাকিস্তানের শিক্ষা যথেষ্ট হয়নি। অনেক পাকিস্তানের বীজ

উপ্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতের হয়ে জামিনদার হবেন কে। আর ইতিহাস সেই জামানত গ্রাহ্যই বা করবে কেন?

কাশ্মীর বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল অশুভ ক্ষণে। আমাদের স্বরাষ্ট্র-পররাষ্ট্র ইত্যাদি সমুদয় নীতি ওই একটি বিরোধে জড়িয়ে গেছে। কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্তির পরেও প্রকৃতই মূল রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা হয়নি। ভূ-স্বর্গকে হতে দেওয়া হয়নি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় মাত্রেরই বসবাসযোগ্য ভূমি। অহেতুক স্বাতন্ত্র্য পুষে রাখা হয়েছে। আর অন্য দিকে আমাদের পররাষ্ট্র-বিষয়ক সমুদয় নীতি বিশেষ একটি দেশের প্রত্যাশিত "ভিটো"র চারপাশে ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়েছে।

অর্থ এবং অধ্যবসায়ের বৃহদংশ ব্যয় হয়ে গেছে বৃহদাকার যোজনার পর যোজনার তালবৃক্ষরোপণে। প্রায় সবই পোস্ট-ডেটেড চেক। আবার সেই যোজনাও আজ ভেসে গেছে দেশরক্ষার নামে বানের টানে। বিরাট হাঁ বার করছে অর্থনৈতিক সর্বনাশের গহ্বর।

*

ধর্মের পর ভাষা। সেখানেও স্বাধীনতার পর বিভেদের লাইনগুলোর নীচেই বড় করে দাগা বোলানো হল। কংগ্রেস তার সাবেকী জেদ আর প্রতিশ্রুতি চড়া হারে সুদ দিয়ে শোধ করতে চাইল। কংগ্রেসী প্রদেশগুলি ছিল মোটামুটি ভাষাভিত্তিক। ঈশ্বর যেমন মানুষকে বানিয়েছিলেন তাঁর নিজের "ইমেজ্"-এ, কংগ্রেসও তেমনই ভাঙা ভারতকে গড়তে গেল তারই সাংগঠনিক "ইমেজ্"-এ। গড়ল, না ভাঙল? রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন খাড়া করে ঘুষ দিয়ে আবদারের মুখ বন্ধ করার আহাম্মুকি করেছিল কে? আত্মসমর্পণ দিয়ে অন্যায়ের সঙ্গে পাকাপাকি সমঝোতা সম্ভব হল কি? অস্ত্র দিয়ে যার শুরু, নাগাল্যাণ্ড সৃষ্টিতেই (মোটে চার লক্ষ লোকের জন্য একটি রাজ্য, ভাবুন একবার!) তার পূর্ণাহুতি এ-কথা যে ভাবে সে হয় ভণ্ড,

নয় মূঢ়। পরে এসেছে হরিয়ানা, ভাঙা পাঞ্জাব আবার ভাগ হয়েছে।

পাহাড়ীদের ইতস্তত মাথাচাড়া দেওয়া যে দাবি, ভাগাভাগির ফরমূলা দিয়ে তারও যদি ফয়সালা করতে ছুটি, তবে অল্পে কুলোবে না। সতেরোটি রাজ্য অচিরে সাতাত্তর হবে—ইতিহাসের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি। তেভাগার এক ভাগ এখন যে পশ্চিমবঙ্গ তা হয়ত উত্তর-দক্ষিণেও ভাগ হবে। লক্ষণ স্পষ্ট, ধোঁয়ার আড়ালে আগুনের আভাস পাচ্ছি।

এক কথায় স্বাধীনতার এই একুশ বছরে (এই রচনার কালে), তার সকল অর্থেই সাবালক হবার সালে, আমরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খৃষ্টান, কেউ বাঙালী, কেউ মারাঠী, কেউ পাঞ্জাবী, কেউ পাহাড়ী।—কিন্তু ভারতীয় একজনও নেই।

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ যে আবার আর্যাবর্ত আর দাক্ষিণাত্য এই দুই এলাকাকে রাষ্ট্রিক অর্থেও সত্য করতে পারে, সেই জুজুর ভয় আর দেখালাম না। আমার বলার কথা "ভাষা।" আহা কী মশলা দিয়েই না জাতীয়তার ইমারতটি গাঁথতে লেগেছি !

*

এক-একটি নতুন রাজ্য সৃষ্টি, অর্থাৎ এক-একটি ফাটল আরও চওড়া করা, দেশের অর্থের আরও অপচয় ! নতুন রাজ্য মানেই নতুন রাজ্যপাল, বিধানসভা, মহাকরণ। বাড়তি ওভারহেড্ এক্সপেন-ডিচার, ব্যয়বহুল বিলাস আর ঠাট। হাঁড়ি আলাদা করা মানেই নতুন হেঁসেল-পাঠ। দেউলে দেশের পক্ষে এসব তামাসা আত্মঘাতী।

অথচ হেঁসেলটাও সত্যিই আলাদা করা যায় কি ? না। আমাদের সংবিধান শুধু শরীরেই ফেডারাল, প্রাণে ইউনিটারি। দেশরক্ষা বলুন, রেল বলুন, ডাক-তার যাই বলুন, এমন-কী রেশনের বরাদ্দ চাল-গম—সব কিছুরই টিকি বাঁধা দিল্লিতে। বড় বড় উন্নয়ন-প্রকল্প, শিল্পের লাইসেন্স, আমদানি-রপ্তানি—কণ্ট্রোল রুম ওই এক এবং

অদ্বিতীয় দিল্লি। দেখেন না, যে-কোন সংকটে পাত্র-মিত্র-অমাত্যেরা সবাই রাজধানীতে কেমন উর্ধ্বশ্বাসে ছোটেন। তবে এই নামকা-ওয়াস্তে ফেডারেল ব্যবস্থা কেন? ওটা আছে শুধু স্থানীয় নেতাদের আঞ্চলিক প্রতিপত্তিকে ঠেকনো দিয়ে খাড়া রাখতে। নেতৃত্বই এদেশে কালে কালে হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বড় ভেস্‌টেড্ ইণ্টারেস্ট। ইণ্টারেস্ট যাচ্ছে আমার আপনার পকেট থেকে।

ঝোঁকটা কেন্দ্রাভিগ জেনেও ফেডারেল কাঠামো রচনা—এটা কি স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে সংবিধান বিধাতাদের তিন নম্বর ভুল? ওই ভাঁওতাটা না থাকলে রাজ্যের পর রাজ্যে—গণতান্ত্রিক রথযাত্রার মাহেশে বা মহিষাদলে—রথ অচল হয়ে থাকত কি? আজ রথে রথে সমাসীন রাজ্যপাল নামে যত জনার্দন একদা তাঁদের সত্যিই মনে হত দারুভূত, কিন্তু রথের সব রশিই চতুর্থ নির্বাচনের পর তাঁদের হাতে। বহু বছর তাঁরা শুধুই ফিতে কাটতেন, আজ আমরা চলছি তাঁরা যেভাবে চালাচ্ছেন। এঁরা ক্ষমতায় ব্রিটিশ আমলের চেয়েও জবরদস্ত গবর্নর এক-একজন—জ্যাকসন বা অ্যাণ্ডারসন।

নির্বাচিত নয়, নিযুক্ত সুপার-নবাব দিয়ে যে রাষ্ট্র চলে, তাকে, আর যাই হোক, গণতন্ত্র বলে না।

*

জানি না, এই তিক্ততা এই হতাশা আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করল কবে এবং কেন। এ কি গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস দেখে, একি চারপাশে ছড়ানো হতশ্রী দৈন্যদশা থেকে? এর দায় কি সবটাই নেতৃত্বের, জনতার এতটুকু নয়?

ভগ্নকণ্ঠে বলছি, সব প্রশ্নের উত্তর জানি না। উচ্চতম নেতৃত্ব কি দীর্ঘকাল অলীক আদর্শবাদে আচ্ছন্ন ছিল, যা ধনিক-বা-শ্রমিক কারোরই আস্থা অর্জন করতে পারেনি, দুনিয়ার সমাজতন্ত্রী আর পুঁজিবাদী দুই শিবিরেরই সন্দেহ আর করুণা কুড়িয়েছে? যথার্থ

নেতৃত্ব দিতে পারত কে? নেতাজীর জন্যে ফেলা চলে শুধুই দীর্ঘ-শ্বাস। আর? গান্ধী-বাণী অনুসরণ অসম্ভব, তাই গান্ধীবাদকে বরবাদ করে ব্যক্তি-গান্ধীকে পূজা নাহয় সার করেছি। কিন্তু সরদারজী যে অকালে অপসৃত, সে-ও কি ইতিহাসের পরিহাস? তাঁর হাতে ভার থাকলে আদর্শবাদের ভাপে ভরা ফানুসটা এত উপরে উড়ত না অবশ্যই, কিন্তু বাস্তবতা-ভিত্তিক প্রকরণে আর পরিচালনায় দেশ কি আরও শক্তিমান ও সংহত হত?

ভারতীয় হিসাবে এই সব কথা ভাবি, আর দেখি, পথ খুঁজে না পেয়ে, শাস্ত্রীজীর স্বল্পায়ু শাসনের পর, একটি দলীয় নেতৃত্ব কীভাবে পারিবারিক উত্তরাধিকারকে ফিরিয়ে আনল। এটা সর্বৈব রাজতন্ত্রের লক্ষণ, আমাদের দিশাহারা গণতন্ত্র নির্বিচারে তারই নকল করল।

*

জানি, মুখে সমালোচনা করা যত সহজ, কাজে কিছু করা কঠিন ততই। এই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন কোটি মানুষের ইণ্ডিয়াতে কোনও যাদু বা ভেল্‌কি, কোনও ইন্‌ড্‌-রা-জাল সত্যিই তো সম্ভব নয়! ভাত আনতে পান্ত ফুরোবে। কিছু হট্টগোল অবশ্যই দলগত বিদ্বেষ-প্রসূত, অনেক গলাবাজি একটি দলের একঘেঁয়েমির ক্লান্তি ঘোচাতে; স্বর্গরাজ্যের হাতছানিতে ভুলে গিয়ে, কিছু-বা নিছক মুখবদলের আশায়।

সবই জানি এবং বুঝি। স্বল্প-স্বল্প খুঁত হলে আমি খুঁত-খুঁত করতাম না। স্বস্তি পেতাম যদি দেখতাম যে গাড়ি ঠিক লাইনেই আছে। মাঝে মাঝে থামছে, ঘটাং-ঘটাং করছে থেকে থেকে—তাতে ভাবনা ছিল না। কারণ দলগত সাত কিংবা পাঁচ, আমি কোনটাতেই নেই।

কিন্তু গাড়িটা ঠিক লাইনে আছে কি? পূজ্য নেতারা আমাদের কপাল-দোষে ঠিকমত সারথি হতে পারেননি। কিন্তু কোথায় সেই স্বীকৃতির সততা, নীতি এবং কৃতির ভ্রম-সংশোধন? বরং দেখি নতুন ভুলের শাক দিয়ে আগের ভুলের মাছ চাপা দেওয়া। শ্লোগান আর

মা কানের দুল ছিঁড়ে আন্দোলনে চাঁদা দিয়েছিলেন। আমি টারগেট—অলীক বুলি আওড়ানো আর অসাধ্য লক্ষ্য নিরূপণের প্রতিযোগিতা, ফ্রী-ফর-অল্ হাফ-আখড়াই।

কোটি কোটি মানুষের সমস্যা, ঠিক। তা-হলে প্রথম প্রয়োজন ছিল পুত্র-কন্যার প্রবল বন্যা ঠেকানো। গোড়ায় এটা অগ্রাধিকার পায়নি, এখন যেটা চলছে সেটারও অনেকটাই চটকদার পাবলিসিটি-বাজি, দশা যদিও স-সে-মি-রে, তবু। এবার মুখের গ্রাসের কথা। আরও অধিক ইস্পাত ফলানোতে যতটা মন গিয়েছে, মাঠের ফলনের দিকে সত্যিই তার অর্ধেক নজরও গিয়েছে কি? বৈজ্ঞানিক প্রথা চালু হল না, জমির মালিকানা সংস্কারের আইন টাইন মরচে-পড়া; অ-প্রযুক্তি বিদ্যার চরম নিদর্শন। খাদ্যে অমুক সালে স্বয়ংভরতা এ-সব আমলা আর অমাত্যদের নিছক বোলচাল, মিথ্যের তুবড়ি বা ফুলঝুরি। লোকে আর মজাও পায় না, নিরন্নেরা শুধু ধিক্কার দেয় নীরবে। খাদ্য যদি যথার্থই গুরুত্ব পেত (ওয়ার বেসিস, না কী একটা গালভরা কথা আছে না?) তবে অন্তত দেশ-দেশান্তরে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এ-জাতির ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জাটা ঘুচত।

শিক্ষা? কিছু বলাই বৃথা। অনেক তর্কের পর এই সবে আমরা যে স্থির করেছি এই খাতে জাতীয় বরাদ্দের শতকরা ছয় ভাগ ব্যয়িত হবে, তাতেই তো বোঝা গেছে শিক্ষাকে আমরা কতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মোটে সিক্স পারসেণ্ট, তার বেশি না। এতকাল এটুকুও দিতাম না।

নিরক্ষরতা আর নিরন্নতার হাড়ে হাড়ে গণতন্ত্রের ভেল্‌কি খেলাচ্ছি।

*

স্বাধীনতা-দিবসে লালকেল্লার র‍্যামপার্ট থেকে আজও খোলতাই গলায় ভাষণ-টাষণ দেওয়া হয়ে থাকে (একেবারে কুতুবের চূড়া থেকে দিলে আরও মহীয়ান হত), জাতির প্রতি জানানো হয় পবিত্র

আহ্বান? ভাড়া-করা ট্রাকে আসন্ধ্যা-সকাল শহরের রাস্তায় হৈ-হুল্লোড় চলে? ওইটুকুই অবশিষ্ট আছে। সেই বিদ্যুন্ময় চেতনা কোথায় গেল যা চোখে চোখে ঝলসে বলে যায় "আমরা স্বাধীন। আজও পাইনি তবু—চেষ্টা করে যাচ্ছি, চেষ্টা আর পরিশ্রম—জাতি হিসেবে প্রাপ্য আসনটি একদিন পাবই পাব।"

সেই ছবিটি দেখি না, যা ছুনিয়ার সব সদ্য-উত্থিত মানব-সমাজে প্রতি চোখে-মুখে আঁকা থাকে। তাই এই লেখার শুরুতেই অতীতের কয়েকটি পাতা মেলে ধরেছি। যেদিন বলতাম "আমরা বিশ্বাস করি···।"

সেদিন বিশ্বাস করতাম। কিছুতে না কিছুতে। আজ? কিছুই না, বিশ্বাস করি না। এই একুশটা বছর আমার সব বিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে।